গাণ্ডীব

ও

নব্বইয়ের দশকের সাহিত্য-আন্দোলন

এটি একটি বিজ্ঞাপন

৪র্থ সংখ্যা

বেরুচ্ছে খুব শীঘ্রই...

আদিবাসী সংখ্যা

গাণ্ডীব

ও

নব্বইয়ের দশকের সাহিত্য-আন্দোলন

গ্রন্থী ও নব্বইয়ের দশকের সাহিত্য-আন্দোলন

গ্রন্থী-৩; বিশেষ সংখ্যা; লন্ডন, তেইশ জুন দুই হাজার আঠার

সম্পাদক
শামীম শাহান

সম্পাদনা সহযোগী
টি এম আহমেদ কায়সার

প্রচ্ছদশিল্প
এন্টনি ফিরিঙ্গি

মুদ্রণ
সিএম মিডিয়া, লন্ডন

যোগাযোগ
470 Arch Unit
Centrell Road, London E3 4BN
shahan06@yahoo.co.uk

The Gronthee (Est. 1993) and literature movement of 1990's, a special publication released on 23rd June 2018 in London. Edited by Shamim Shahan and co-operated by T M Ahmed Kaysher
Printed by CM Media, www.cmmediauk.com

গ্রন্থী সূচী (বিশেষ সংখ্যা)

তেইশ জুন দুই হাজার আঠার

জফির সেতু // 'ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অব টাইমস্/ইট ওয়াজ দ্যা ওয়ার্স্ট অব টাইমস্' ৭

মোস্তাক আহমাদ দীন // প্রসঙ্গত গ্রন্থী এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ ১৪

ফকির ইলিয়াস // সিলেটে সাহিত্য আড্ডা ও আমাদের *গ্রন্থী*কাল ১৮

মাহবুব লীলেন // কবিতাখোর ২২

আহমেদুর রশীদ টুটুল // আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ ২৬

টি এম আহমেদ কায়সার // যৌবন ক্ষয়ের সোনাঝরা উপাখ্যান ২৭

শামীম শাহান // গ্রন্থী: পুনরুজ্জীবন ও নতুন যুগের ডাক ৩০

পরিশিষ্ট // ১: তেইশ জুন দুই হাজার আঠার: লন্ডনে বিশেষ আড্ডা ৩৭

পরিশিষ্ট // ২: আড্ডা ৩৮

পরিশিষ্ট // ৩: গ্রন্থী ১ম ও ২য় সংখ্যার প্রচ্ছদ ৪৫

পরিশিষ্ট // ৪: গ্রন্থী ১ম ও ২য় সংখ্যার লেখকসূচী ৪৭

পরিশিষ্ট // ৫: গ্রন্থী ১ম ও ২য় সংখ্যার সম্পাদকীয় ৪৯

পরিশিষ্ট // ৬: সম্মাননা ৫৪

আমার ভাবতে খুব ভালো লাগছে যে, দীর্ঘদিন পর আবারও *এ'স্থী* প্রকাশিত হচ্ছে। *এ'স্থী*র এই প্রকাশনা ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন দেশে, যুক্তরাজ্যে। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে *এ'স্থী* প্রকাশিত হয়েছিল বিশেষ এক এজেন্ডা নিয়ে, বাংলা লিটল ম্যাগ আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে। পর পর দু'টি সংখ্যা বেরিয়েছিল *এ'স্থী*র। তৈরি করেছিল একটি সাহিত্য বলয়। সত্যি বলতে এটি ছিল একটি গোষ্ঠীপত্রিকা। এবং সেটি একটি সময়েরই প্রতিবিম্বত্তা। *এ'স্থী*র প্রকাশনা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল বছর তিনেকের মধ্যে; তা হলেও একটি সময়খন্ড ধারণ ছাড়াও- এর প্রভাব ও রেশ রয়ে গেছে দুই যুগেরও অধিক কাল ধরে।

এ'স্থী ছিল একটি বৈরি সময়ের মুখপত্র- একটি লিটল ম্যাগ। এর লোকগোষ্ঠীর সকলেই ছিলেন অতীব তরুণ। সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এর লেখককুল; ছিলেন সবাই দ্রোহী, নতুন চিন্তার ধারক ও বাহক এবং সবাই ছিলেন প্রতিশ্রুতিশীল। ... প্রতিশ্রুতিশীল যে ছিলেন তার পরিচয় আমরা দেখতে পাই, *এ'স্থী*র লেখককুলের বেশির ভাগই এখন সৃজনশীল সাহিত্য জগতে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। অনেকে পরবর্তীকালে সাহিত্য সম্পাদক ও পত্রিকা সম্পাদনায় বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। ... আবার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, ক্ষুব্ধ এই বর্তমানে অনেকেই হয়েছেন দেশান্তরী। ... কিন্তু সৃজনশীলতা কিংবা সাহিত্য-রচনা থেকে কেউই পিছপা হননি। *এ'স্থী*র তুর্কি-বৃন্দ আজ স্বস্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। অতিক্রম করছেন পড়ন্ত যৌবন। তাহলে, সৃজনশীলতা, কর্মতৎপরতা এবং চিন্তায় প্রত্যেকেই আজ অতীব-তরুণ। যে কথাটি মাথায় রেখে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বৈশ্বিক পরিমন্ডল বিবেচনা করে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা *এ'স্থী*র লেখককুলকে আবারও এক জায়গায় দাঁড় করানোর অভিপ্রায়ে, স্মৃতি মেরুর বর্তমান সংখ্যাটি নতুন পর্বের একটি প্রস্তুতি সংখ্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এবং এই আত্মপ্রকাশকে কেন্দ্র করে লন্ডনের সেন্ট মারগারেট হাউস হলে আয়োজিত হতে যাচ্ছে একটি অন্যরকম মিলনমেলার।

আমরা *এ'স্থী*র লেখকদের আহবান করেছিলাম *এ'স্থী* নিয়ে জাবর-কাটার জন্য। অতি অল্প সময়ে, নানা ব্যস্ততার মধ্যে লেখা দিয়েছেন অনেকেই। সময়-সংক্ষিপ্ততার জন্য অনেকে লেখা দিতে পারেননি– এ দায় তাদের নয়, আমাদের। এজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

অচিরেই *এ'স্থী* আদিবাসী সংখ্যা নিয়ে বিস্তৃত কলেবরে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। সে জন্যে *এ'স্থী*র প্রকাশিতব্য সংখ্যার লেখকদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি বর্তমান সংখ্যার লেখক-বন্ধুদের। আশা করছি প্রতিকূলতা ও অভিমান ভুলে *এ'স্থী* আবারও কাঁটা-বিছানো পথে হাঁটতে থাকবে।

প্রিয় পাঠক যোদ্ধা, আপনারা *এ'স্থী*র সঙ্গে থাকুন।

শুভেচ্ছা সবাইকে।

- সম্পাদক

জ ফি র সে তু

‘ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অব টাইমস্/ইট ওয়াজ দ্যা ওয়ার্স্ট অব টাইমস্’

বাংলা লিটলম্যাগের পথিকৃত প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রর জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে শামীম শাহান সম্পাদিত *এ্রন্থী*র জন্মেতিহাসের একটা সাদৃশ্য রয়েছে। সেটা হলো সবুজপত্রর জন্ম-লগ্নে পৃথিবী ঢুকছিল এক নতুন বাস্তবে। ইউরোপের নজর পড়েছিল তখন বলকান রাষ্ট্রগুলোর ওপর, আর অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য, তুরস্ক সাম্রাজ্য বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া। অস্থির পৃথিবীজুড়ে নতুন বিশ্বের পদধ্বনি শোনা গেল; আরবরা বেরিয়ে গেল তুরস্ক থেকে; তুরস্ক বনে গেল খোদ ইউরোপ; পৃথিবী হলো মৃত্যু-উপত্যকা। ভারতেও স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল। শিল্পী-সাহিত্যিকরা পেল নতুন বোধ, নতুনচেতনা; গড়ে উঠতে লাগল নতুনতর শিল্পের বুনিয়াদ। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে। সেই সময়ে সবুজপত্রর আত্মপ্রকাশ। একক ব্যক্তির হাত ধরে; তারপর এর মিথ হয়ে ওঠা ।

প্রায় পঁচাত্তর বছর পর, মাঝখানের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবসভ্যতাকে এক নতুন বাস্তবতায় ঠেলে দিয়ে, দুইমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় স্নায়ুযুদ্ধ যেখানে দানা বেঁধে উঠেছে; একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে রাশিয়ার জোট শক্তিগুলো। ঠিক তখন একটা বোমা ব্যবহার না-করেই রাশিয়ার বিপরীতে আমেরিকার জয় হলো। পৃথিবীতে জেগে উঠল পুঁজিবাদের দানব; আর তার ছত্রছায়ায় বহুরূপী গণতন্ত্র, যার মুখপাত্র বিশ্বায়ন নামক জবরজঙ্গ আলেয়া। পুঁজিবাদেরই এক নবতর খেলায় বাংলাদেশে সামরিক শাসনের উত্থান, আবার বিলয়; নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলন। অর্থাৎ নতুন বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের নতুন গণতান্ত্রিক বাস্তবতার কালে নব্বইয়ের মাঝামাঝিকালে *এ্রন্থী*র আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাও একক ব্যক্তির উদ্যোগে।

নতুন কাল যেহেতু নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসে, বিশশতকের প্রারম্ভের কালে সবুজপত্র বঙ্গদেশে এক ভাবের বিপ্লব সাধন করেছিল এবং অবশ্যই তা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই। কিন্তু *এ্রন্থী*র কালটাও টালমাটাল ছিল; প্রমথ চৌধুরী বা রবীন্দ্রনাথের মতো বিরল প্রতিভা তার আশেপাশে ছিল না ঠিকই, তবে ক্ষণকালের স্ফূলিঙ্গের মতোই পত্রিকাটি সময়ের দাবি মিটিয়েছিল। লিটলম্যাগ হিসেবে গ্রন্থীর গুরুত্ব এখানেই।

একটা বৈরি পরিবেশে *এ্রন্থী* পথচলা শুরু করে; এমনটা অবশ্য বঙ্গদর্শন থেকে শুরু করে সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাই নিজের দায়িত্ব পালন করে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও এর পথ প্রশস্ত করতেই লিটলম্যাগগুলো ক্ষণকালের উদ্ভাস নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেদিক থেকে বললে সাধনা, ভারতী, সাহিত্য, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সাময়িকপত্রই সবুজপত্রকে পথ

দেখিয়েছিল। এসব পত্রপত্রিকার সবটিই ঠিক এক অর্থে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও আত্মপ্রত্যয়ী। এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সবুজপত্র শুধু যে লেখকগোষ্ঠী তৈরি করেছিল তা নয়, এর সকল কাজ ছিল বৈপ্লবিক। ভাষাদর্শন, ভাষাপ্রয়োগ, সাহিত্যের ভাষা, মান ভাষা এসব বিষয়ে মৌল প্রস্তাবনাসহ সাহিত্যে আদর্শ, সাহিত্যের রীতি ও সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত বিষয়াবলি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সত্যিকার আধুনিকতার প্রচলে পথিকৃতের ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয়, সাহিত্যপাঠকের শুচিবাই দূর করতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

সবুজপত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে যে-ভূমিকা রাখে তা থেকেই পরবর্তীকালে শিক্ষা নেন নবীন সাহিকত্যকর্মীরা। সাহিত্য যে শুধু সৃষ্টির বিষয় নয়, এটা আন্দোলনের জিনিস তা উপলব্ধি করেই তিরিশের দশকে একদল তরুণ কবি ও লেখক কলকাতা ও ঢাকা থেকে বিপ্লবী মনোভাব নিয়ে সহিত্যআন্দোলন শুরু করেন। তাদের আন্দোলনের দুটি দিক ছিল; একটি হচ্ছে রবীন্দ্রবিরোধিতা করে নতুন কাব্যরীতি প্রতিষ্ঠা; আর অপরটি হচ্ছে, নতুন সাহিত্যাদর্শ সৃষ্টি। নতুন ধরনের সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বর বাহন ছিল বেশ কয়েকটি লিটলম্যাগ-জাতীয় কাগজ। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা ও প্রগতি, দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদিত কল্লোল, কালিকলম, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, নিরুক্ত, একক প্রভৃতি পত্রিকা ছিল নতুনধারার সাহিত্যের বাহন। এরা মূলত বাংলা আধুনিকতাবাদী সাহিত্যের উদ্‌গাতা। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে ইউরোপে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, শিল্প, চিত্রকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও অগ্রযাত্রা সাধিত হয় তারই প্রতিফলন ছিল এইসব তরুণ সাহিত্য ও পত্রিকাগোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডে। এপর্বে বাংলা সাহিত্য বিশ্বমানের হয়ে ওঠে এবং বাংলা সাহিত্যে একটা বৈশ্বিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়।

দেশভাগের আগে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের শিখা, নাসিরুদ্দিনের সওগাত ও পরে সিকানদার আবু জাফরের সমকাল, ফজল শাহাবুদ্দিনের কবিকণ্ঠ এবং ষাটের দশকে বক্তব্য, সাম্প্রতিক, উল্কা, শাবস্তী, উত্তরণ, কণ্ঠস্বরসহ বিভিন্ন লিটলম্যাগ বাংলাদেশের সাহিত্যের বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। এই সময় লিটলম্যাগকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে নানা সাহিত্যক আন্দোলন। রফিক আজাদ, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সিকদার আমিনুল হক প্রমুখ লিটলম্যাগেরই সৃষ্টি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেখা যাবে কবিতা ও কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী লেখক তারা সকলেই লিটলম্যাগ থেকে উঠে আসা। সুতরাং বরাবরের মতো আধুনিক বাংলা সাহিত্য চর্চার দিক থেকে লিটলম্যাগই মেনস্ট্রিমের ভূমিকা পালন করে এসেছে।

অন্যদিকে আশির দশকে বাংলাদেশে যখন স্বৈরাচারী সামরিক শাসন চলছিল এবং জনজীবন ছিল নেতিয়ে পড়া ও স্থবির, তখনও তরুণরা লিটলম্যাগকেই আত্মপ্রকাশের একমাত্র বাহন হিসেবে বেছে নেন। কেননা সামরিক জান্তা সকল প্রতিষ্ঠানকেই গুড়িয়ে দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে দালাল

লেখক-বুদ্ধিজীবী তৈরি হয়েছিল। পত্রিকাগুলো ছিল সামরিকদের দখলে; জাতীয় দৈনিক থেকে শুরু করে মফস্বলের পত্রিকাটি পর্যন্ত। সামরিক জান্তা নিজেও কবি হিসেবে আত্মপ্রচার করে; তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার লোকের অভাব হয় না। এর আগে ছদ্ম সামরিক শাসক মেজর জিয়াও কবিদের নিয়ে বঙ্গোপসাগরে নৌবিহার করেন। সত্যিকার অর্থে বাংলা কবিতা ও বাংলা সাহিত্যর দুর্দিন উপস্থিত হয়েছিল। আশির দশকের শেষ সময়ে এবং নব্বইয়ের দশকে খোন্দকার আশরাফ হেসেনে *একবিংশ*, মঈন চৌধুরীর *প্রান্ত*, তপন বড়ুয়ার *গাঙীব*, আনওয়ার আহমদের *কিছুধ্বনি* ও *রূপম* নতুন করে সাহিত্যগোষ্ঠী তৈরিতে তৎপর হয়। এসময় লিটলম্যাগ আন্দোলন শুধু আর কেন্দ্রমুখী না-থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই বগুড়া থেকে ফারুক সিদ্দিকীর *বিপ্রতীপ*, কামরুল হুদা পথিকের *দ্রষ্টব্য*, চট্টগ্রাম থেকে এজাজ ইউসুফীর *লিরিক*, জাফর আহমদ রাশেদের *আড্ডারু*, সাজিদুল হকের *সুদর্শনচক্র*, হাফিজ রশিদ খানের *পুষ্পকরথ*, মংমনসিংহ থেকে সরকার আজিজের *অনুশীলন*, রাজশাহী থেকে হাসান আজিজুল হকের *প্রাকৃত*, শিমুল মাহমুদের *কারুজ*, বরিশাল থেকে হেনরী স্বপনের *জীবনানন্দ*, দিনাজপুর থেকে ইতি ইব্রাহিমের *শব্দশিল্প*, যশোর থেকে শিমুল আজাদের *বিবর*, ঠাকুরগা থেকে রাজা শহীদুল আসলামের *চালচিত্র*, রংপুর থেকে *ছাপাখানা* এবং সিলেটে থেকে শুভেন্দু ইমামের *শিকড়*, আহমেদুর রশীদ সম্পাদিত *শুদ্ধস্বর* প্রভৃতি লিটলম্যাগ নিজ নিজ লেখকগোষ্ঠী নিয়ে তৎপর হয়। লিটলম্যাগ আন্দোলন শুধু বাংলাদেশের নয়, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাতেও বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে সমান তালে চলে আসছিল এবং সম্পাদক ও সাহিত্যগোষ্ঠার মধ্যে ছিল সাহিত্যিক যোগাযোগ ছাড়াও লিটলম্যাগ বিনিময়, সাহিত্য সম্মেলন ও লিটলম্যাগ সম্মেলন ইত্যাদি। ঠিক এসময়ই আবার সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে উত্তর-আধুনিকতাবাদ, উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ, বিনির্মাণবাদ প্রভৃতি তত্ত্ব দ্বারা আন্দোলিত হন কবি-সাহিত্যকরা। ঠিক এরূপ পটভূমিতে নব্বাইয়ের শুরুতেই শামীম শাহান *গ্রন্থী* প্রকাশে উদ্যোগী হন।

২.

গ্রন্থী হঠাৎ প্রকাশিত হয়নি। এর পূর্বপ্রস্তুতি ছিল। সিলেটে এর আগে দিলওয়ারের *সমস্বর* ও শুভেন্দু ইমামের *শিকড়* প্রকাশিত হয়েছিল লিটলম্যাগের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য নিয়েই। কিন্তু পত্রিকাদুটোই ওইভাবে জাতীয়মানের লেখক তৈরিতে তেমনটা ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে মূলধারার সাহিত্যের পাঠক তৈরিতে দুটি পত্রিকাই সিলেটে অসাধারণ ভূমিকা পালন করে। কলকাতা বা ঢাকাকেন্দ্রিক লিটলম্যাগ আন্দোলনে সত্যিকার কর্মী হিসেবে আহমেদুর রশীদ যখন সিলেটে আবির্ভূত হন, তখন তিনি কলেজের ছাত্র। তিনি কয়েকজন তরুণ কবিবন্ধু জোগাড় করতে পেরেছিলেন সহযোদ্ধা হিসেবে, তাদের মধ্যে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করার মতো তিনি আহমদ

মিনহাজ। দুজনই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এই সময়ে আমিও অন্য অনেকের মতো সিলেট শহরে আসি কলেজে ভর্তি হয়ে। আর যারা এসেছিলেন সিলেটের বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের মধ্যে নাসিমূল হক, সরওয়ার চৌধুরী, শামীম শাহান, রকিব আল হাফিজ, শাহ শামীম আহমেদ, নাজমুল হক নাজু, শাহ তোফায়েল আহমদ, মাহবুব লীলেন, মো. জিয়াউদ্দিন, হেলাল আহমদ চৌধুরী প্রমুখ। এরা সকলেই কবিতা অন্তপ্রাণ ছিলেন। এরও পরে আসেন পাশু প্রাপণ, টিএম আহমেদ কায়সার, ফজলুররাহমান বাবুল, মোস্তাক আহমাদ দীন, হাবিবুর রহমান এনার, জওয়াহের হোসেন, সৈয়দ আফসার প্রমুখ। *শুদ্ধস্বরের* তৃতীয় সংখ্যা বের হয় ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে। সম্ভবত এটিই প্রথম *শুদ্ধস্বরের* পরিকল্পিত সংখ্যা। নতুনধারা সাহিত্যসৃষ্টি তরুণ কবি-লেখকদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়াই ছিল সম্পাদকের মূল উদ্দেশ্য। আমার মনে আছে এক শীতের সকালে আহমেদুর রাশীদ ও আহমদ মিনহাজ মুরারিচাঁদ ক্যাম্পাসে আসেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি তখনও লিটলম্যাগর ব্যাপারে অতটা সচেতন হয়ে উঠিনি। তারপর *শুদ্ধস্বর* অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। বলতে গেলে *শুদ্ধস্বর*ই ওইসময় তরুণদের ভেতরে একটা আগুনের মন্ত্র দিতে পেরেছিল এবং সে-আগুন থেকে জন্ম নিচ্ছিল ফিনিক্স পাখিদের। আমাদের তখন পারস্পরিক যোগাযোগ হতে থাকে, নিখাদ বন্ধুত্বের সঙ্গে সাহিত্য ও সাহিত্য আন্দোলনও যুক্ত হয়। ঢাকা ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হতে থাকে; এমনকি বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মফস্বলের সঙ্গেও।

নতুন ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি, যা বাজারি সাহিত্য নয়-এমন সাহিত্যের স্বপ্ন; এবং এমন স্বপ্নবাস্তায়নে লিটলম্যাগ আন্দোলনে আমরা সবাইই কমবেশি জড়িয়ে পড়ি। নতুন নতুন পত্রিকা বেরুবার পরিকল্পনা মাথায় আসে; বের হয়; সকলেই লেখা তৈরি করি, প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হয়ত একজন, কিন্তু পত্রিকার স্বত্বাধিকারী যেন সকলেই। এভাবে সিলেটে একে একে প্রকাশ পেতে থাকে মোস্তাক আহমাদ দীন সম্পাদিত *বিকাশ*, টি এম আহমদ কায়সার প্রমুখ সম্পাদিত *প্যারাডাইম*, নাজমুল হক নাজু সম্পাদিত *ঘাস*, হাবিবুর রহমান এনার সম্পাদিত *খোয়াব*, শাহ শামীম আহমদ সম্পাদিত *হৃদি*, ফজলুররহমান বাবুল সম্পাদিত *ঋতি*, মুস্তাফিজ শফি সম্পাদিত *চোখ*, আবদুল মুমিন মামুন সম্পাদিত *স্বকাল*, হেলাল আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত *ফিনিক*, হেলাল উদ্দিন সবুজ সম্পাদিত *নদীপাখিমেঘ*, শুভেন্দু ইমাম সম্পাদিত *পাঠকৃতি*, মাশুক ইবনে আনিস সম্পাদিত *কাকতাড়ুয়া*, নাজমুল আলবাব সম্পাদিত *শস্যপর্ব*, তাপু শিকদার সম্পাদিত *কীর্তনিয়া*, আহমদ সায়েম সম্পাদিত *সুনৃত* প্রভৃতি। ঠিক একই ধারাবাহিকতায় গ্রন্থীও প্রকাশ, কিন্তু অন্যভাবে, অনন্য ভূমিকায়।

শামীম শাহান লিখতেন কবিতা। এসেছিলেন জকিগঞ্জ থেকে। প্রথমেই তার ভালোবাসার প্রকাশ ছিল সাহিত্য ম্যাগাজিন *অসীমের সন্ধানে*। আমাকে দিয়ে একটা গল্প লিখিয়ে নিয়েছিলেন, আমার মনে আছে 'অরণ্যে গোলাপ'। গল্পটি আনাড়ি হাতের লেখা। মনে আছে পাবলো নেরুদার

আত্মস্মৃতি পড়ে এক যৌবনবতীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ রাতের ঘটনা আমাকে খুব আলোড়িত করেছিল। শাহান আমাকে গল্প লেখার আমন্ত্রণ জানালে, প্রান্তিক জীবনের প্রেক্ষাপটে আমি গল্পটি লিখেছিলাম। একথাটি এখানে উল্লেখের কারণ হচ্ছে, সত্যিকার সাহিত্যকর্মী না-হলে, আর সাহিত্যের প্রতি দায় না-থাকলে একটি আধা লিটলম্যাগধর্মী কাগজে এমন গল্প ছাপতেন না তিনি। তার ভেতরে তখন থেকেই একজন লিটল ম্যাগ সম্পাদকের জন্ম হচ্ছিল।

অসীমের সন্ধানে আর বের হয়নি। শামীম শাহান ঘোষণা দিলেন লিটলম্যাগ করবেন। তখন সাহিত্যই আমাদের জীবন। ঘুম ছাড়া জীবনের সকল ঘটনাই সাহিত্যকেন্দ্রিক। ভালো ছাত্র হতে পারছি না, ভালো প্রেমিক হতে পারছি না, ভালো রাজনৈতিক কর্মী হতে পারছি না, ভালো টিউটর হতে পারছি না সাহিত্যের মারাত্মক 'ক্ষতি' হয়ে যাবে বলে। দিন নেই, রাত নেই, বাড়ি নেই, ঘর নেই, খাওয়া নেই, গোসল নেই; শুধু সাহিত্য, আর তার প্রকাশের মাধ্যম-লিটলম্যাগ। সারা বাংলাদেশ, সারা পশ্চিমবঙ্গেই আমাদের বন্ধু। আমাদের বুকভরা স্বপ্ন বাজারি সাহিত্য করব না, বাজারি পত্রিকায় লিখব না। কেননা বাজারি রুচির সঙ্গে আমাদের রুচি মেলে না। বাজারি আদর্শ আমাদের আদর্শ না। আমরা মৌলিক কিছু সাহিত্য করতে চাই। আমরা রবীন্দ্রনাথকেও গ্রাহ্য করি না। জীবনানন্দ আমাদের আদর্শ। মানিক আমাদের আদর্শ। সে পথে চলতে হবে। জনপ্রিয়তা আমরা চাই না। মানুষ আমাদের চিনুক, আমরা চাই না। আমরা চাই হাতেগোনা লোক আমাদের লেখা পড়ুক। বাংলা সাহিত্যের ন্যূনতম সমৃদ্ধি হোক। সুতরাং সমকালে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, বা হাতের কাছে দিলওয়ার যেসব কবিতা লিখছেন কিংবা দূরে সুনীল, শক্তি যেসব লিখছেন এ আমরা চাই না। আমরা চাই উৎপলকুমার বসু, মনীন্দ্র গুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার মলয় রায় চৌধুরী, ফাল্গুনী রায় প্রমুখ। এরা কেউ তত পরিচিত না, জনপ্রিয় না। জনপ্রিয়তাকে আমরা ঘৃণা করি।

শামীম শাহান তখন থাকতেন কুয়ারপারের ইঙ্গুলাল রোডে। ওটাই বাসা, পড়ার ঘর, আড্ডাখানা ও অফিস। পড়তেন গণিতে। লিখতেন কবিতা; হতে চাইতেন সম্পাদক। হলেন। তিনি আমাদের সবাইকে জড়ো করতে পেরেছিলেন। ধারদেনা করে প্রথম সংখ্যা *গ্রন্থী* বেরুলো ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে। সবুজ মলাটের। প্রচ্ছদ আঁকলেন হেলাল আহমদ চৌধুরী। মনে আছে প্রথম সংখ্যায় আমি একটি গল্প লিখেছিলাম। 'নিহত ম্যান্ডোলিন'। কয়লাশ্রমিকের প্রেম-দাম্পত্য-সংকট ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে। ছদ্মনামে শিল্পসমালোচনামূলক একটা লেখাও লিখেছিলোম। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, দার্শনমূলক রচনা ছাপা হয়েছিল। প্রথম সংখ্যা বেরুতেই হইচই পড়েছিল সর্বত্র। বিশেষত প্রত্যেকটি লেখা নিয়ে। লিখেছিলেন আমাদের প্রতিদিনে বন্ধু ছাড়াও দূরের বন্ধুরা। আমার মনে আছে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকের কাছে শাহান বিজ্ঞাপনের জন্য যাননি।

প্রথম সংখ্যা বেরুবার পরই দ্বিতীয় সংখ্যা নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু। বন্ধুরা বলাবলি করি টাকা আসবে

কোথা থেকে। এব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া শামীম শাহান। বলেন নিজেদের লেখাটি আগে দাও, তারপর টাকার চিন্তা। আমরা পরিকল্পনা করি, নতুন সংখ্যা কিভাবে সাজানো যায়। সম্পাদক ঠিক করলেন, কবি দিলওয়ার সংখ্যা করলে কেমন হয়? হ্যাঁ। সিদ্ধান্ত নেওয়াও হলো। দিলওয়ারের ব্যাপারে আমাদের একটা পক্ষপাত ছিল, সেটা আঞ্চলিক কারণে নয়। দিলওয়ার অত্যন্ত বিনয়ী কবি। জাতীয় পর্যায়ে দলাদলির কারণে অনেকটা উপেক্ষিত তিনি। অথচ তিনি একজন মানবতাবাদী কবি। কিন্তু অনেক চেষ্টা-তদবিরের পরও তেমন সহযোগিতা আমরা পাইনি বিভিন্ন মহল থেকে। খোদ কবির ভূমিকাও ছিল প্রশ্নসাপেক্ষ। অনেকদিন হাঁটাহাঁটির পর শামীম শাহান দিলওয়ার সংখ্যা করবেন না বলে সিদ্ধান্ত পালটান। এবং নতুন ভাবনা ও চিন্তামূলক এবং পরীক্ষামূলক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সমেত একটি সাধারণ সংখ্যার সংকল্প করেন। গ্রন্থীর জন্য সকলেই আমরা লিখতে বসে যাই। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে *গ্রন্থী* দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন আহমদ মিনহাজ, সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ, নাসিমুল হক প্রমুখ, গল্প লিখেছিলেন মাহবুব লীলেন, অনুগল্প লিখেছিলেন সম্পাদক নিজে, নিকো লর্ডকিপানিজের গল্প 'দ্য ওম্যান ইন ব্লাক' ভাষান্তরিত করেছিলেন টি এম আহমদ কায়সার। কবিতা লিখেছিলেন হাফিজ রশিদ খান, মুজিব মেহদী, আশরাফ রোকন, মোস্তাক আহমাদদীন, জফির সেতু ও পাশু প্রাপণ। একগুচ্ছ মণিপুরি কবিতা ভাষান্তরিত করেছিলন এ কে শেরাম। স্মৃতিমূলক গদ্য লিখেছলেন আহমেদুর রশীদ, তখন তিনি ঢাকা প্রবাসী হয়ে পড়েছেন।

*গ্রন্থী*র দুটি সংখ্যা শুধু কয়েকটি লেখা ছাপায়নি; সমকালে উভয় বঙ্গে যে লিটলম্যাগ আন্দোলন চলছিল বাজারি সাহিত্যের বিপরীতে; সে আন্দোলনে *গ্রন্থী* ছিল সোচ্চার। *গ্রন্থী*র প্রকাশনাকে কেন্দ্র করে যেসব আড্ডা, আলোচনা, সমালোচনা ও সাহিত্য আসর হয়েছিল তাতে একদল নবীন লেখক অক্সিজেন পেয়েছিলেন সাহিত্যজীবনের সূচনালগ্নে। শামীম শাহানের সাংগঠনিক ক্ষমতা আমাদের সকলের চেয়ে বেশি ছিল বলে তিনি আহমেদুর রশীদের মতো তরুণবন্ধুদের একত্র করতে পেরেছিলেন। মূলত *শুদ্ধস্বর* ও *গ্রন্থী* আমাদের সমকালে, বন্ধুদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এত বছর পেরিয়ে এসেও।

৩.

একটা ক্ষোভ ও অভাববোধ থেকেই লিটলম্যাগ আন্দোলন সকল দেশেই শুরু হয়। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়। শামীম শাহানের সে ক্ষোভ ছিল, অভাববোধ ছিল। ছিল আমাদেরও। তাই *গ্রন্থী*র ভূমিকায় একবার লিখেছিলেন, 'নান্দনিক শুভেচ্ছা নয়। *গ্রন্থী*র প্রতিটি মুদ্রিত অক্ষর, প্রতিটি মুদ্রিত শব্দ অভিবাদন জানায় লিটল ম্যাগের আপোষহীন যোদ্ধাদের। জানি পথ দুর্গম, গ্রন্থিল। আকাবাকা। পদে পদে পিছলানোর ভয়। ধৈর্য ও সংযমকে ক্লেদাক্ত করার হাতেরও সংখ্যা কম

নেই জানি। আবার এও জানি, পথ যতই বন্ধুর হোক-সাহসীরা কখনো হেলে না। তোমরাও হেলবে না; এম কামনা *গ্রন্থী*র শুরুতেই।'

কথা হচ্ছে কিসের ক্ষোভ, কিসের অভাববোধ? আর যে-আপোষহীনতার কথা বলা হলো, তা কিসের? এগুলোই আজকের দিনে মৌলিক প্রশ্ন। ক্ষোভটা ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রতি; সেটা জানা কথা। কিন্তু অভাবটা? সেটা দায়িত্ববোধের যেমন, কমিটম্যান্টেরও। এই দায়িত্ব মাতৃভাষার প্রতি, কমিটম্যান্ট শিল্পের প্রতি। আমরা এমন একটা সময়ে শুরু করেছিলাম, যখন পৃথিবীর সবকিছুই ছিল পণ্য। আবেগ, উপলব্ধি, মমতা, প্রেম, সাহিত্য, শিল্প, মানুষ, যৌনতা-সব। পুঁজিবাদের একধরনের উত্থানের যুগে আমাদের যাত্রারম্ভ। পৃথিবী থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করার চেষ্টা চলছে সাম্যবাদকে। গণতন্ত্র হয়ে উঠছে মুষ্টিমেয় মানুষের শাসন। তৈরি হচ্ছে দেশে দেশে নয়া সাম্রাজ্যবাদ। ঔপনিবেশবাদ গোলকায়নে রূপান্তরিত হচ্ছে। মানুষের মূল্য কমছে, শ্রমের মূল্য বাড়ছে। বড়ো মাছ ছোটো মাছকে গ্রাস করছে। পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ চলে যাচ্ছে মুষ্টিমেয় কটি দেশের হাতে, কয়েকটি মানুষের হাতে। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আগ্রাসন চলছে। বিপন্ন ভাষাগুলোর মৃত্যু হচ্ছে, সাংস্কৃতিক পরিচয় হারিয়ে যাচ্ছে। সেই এক কঠিন সময়। সে-সময়ে সাহিত্য ও সাহিত্য সম্পাদনা। সাহিত্যের মূল্য কানাকড়িও নেই। সাহিত্য পরিণত হচ্ছে পুরস্কারে। পুরস্কার দিচ্ছে করপোরেট হাউস। মানুষ কিনছে, সাহিত্য কিনছে, রুচি কিনছে; কিনছে শিল্পকে। ফলে তখনকার দিনে সাহিত্য মানে একধরনের চিৎকার, কান্না। অস্তিত্বরক্ষার কান্না। যুদ্ধ। সাহিত্য সম্পাদনাও। পুঁজিবাদ যে-প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ তৈরি করছে, এক অমানবিক সমাজ তা থেকে উত্তরণের স্বপ্নই ছিল সে-সময়ের লিটলম্যাগ আন্দোলনের একটা বড়ো কমিটম্যান্ট। অবাক লাগে আজকের দিনে এমন কমিটম্যান্ট আর চোখে পড়ে না। শামীম শাহান আজ ইউরোপে থাকেন। তিনি কি জানেন আজকেও বাংলাদেশে লিটলম্যাগ কর্মী আছেন; হয়ত আন্দোলনও আছে; আর সেটা নেহাত একটা ওপরে ওঠার সিঁড়ি মাত্র? করপোরেট হাউসে চাকরি করে, করপোরেটের টাকায় লিটলম্যাগ বের হয় বাজারি সাহিত্য দিয়ে। এটাও নয়া দুনিয়া বা নয়া বিশ্বব্যবস্থার একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার ভেতরে আমরাও। বিলীন। শুধু নয়া সাহিত্যের স্বপ্ন তিরোহিত হয় না; স্বপ্নের মুত্যু হয় না। শিল্পের তো নয়ই।

মো স্তা ক আ হ মা দ দী ন

প্রসঙ্গত গ্রন্থী এবং অন্যান্য অনুষঙ্গ

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে রাজা ম্যানশনের সাথী লাইব্রেরীর সামনে হঠাৎই পরিচয় হয়ে গেল শামীম শাহান ও শাহ শামীম আহমেদের সঙ্গে আর তখনই দু-জনের একজন– সম্ভবত শাহ শামীম আহমেদ– আমাকে জানান, আমার গ্রামের ঠিকানায় প্রকাশিতব্য *শুদ্ধস্বর*-এর জন্য একগুচ্ছ কবিতা চেয়ে দশ-দশটি চিঠি/পোস্টকার্ড পাঠিয়েছেন, কিন্তু কোনো সাড়া পাননি। *শুদ্ধস্বর* তখন প্রেসে, তাই যেহেতু সরাসরি দেখা হয়ে গেল, দু-জনেই বললেন, আমি যেন দ্রুত হাতে-হাতে একগুচ্ছ কবিতা তুলে দিই এবং বলাই বাহুল্য এই আন্তরিক আহ্বানের পর থেকেই আমি সেখানকার নিয়মিত আড্ডারু : সাথী থেকে মালঞ্চ-এ, মালঞ্চ থেকে অনুপম-এ, আবার সেখান থেকে নতুন ছোটকাগজ ও বইয়ের খোঁজে বইপত্র-এ– তখন এই ভাবেই আমাদের দিনরাত একাকার।

তখন মনে মনে *শুদ্ধস্বর*-এর জন্য অপেক্ষা করছি, কিন্তু এক দুপুরে *শুদ্ধস্বর* বের হওয়ার আগেই হাতে এল প্রথম সংখ্যা *গ্রন্থী*, হেলাল আহমদ চৌধুরীর আঁকা কলাপাতারঙের প্রচ্ছদ, সম্পাদক শামীম শাহান, সহ-সম্পাদক হেলাল আহমদ চৌধুরী ও লায়েক আহমদ নোমান। শামীম শাহান দু-একদিনের মধ্যে আলোচনার জন্য বলায় সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠ-এর সাহিত্যপাতায় একটি দীর্ঘ আলোচনা লিখি, যাকে বলে বারো হাত পাকুড়ের তেরো হাত বিচি, শিরোনামও বেশ অলঙ্কৃত : '*গ্রন্থী* : শুকনো আঁধারে একটুকরো আলোজল'। আলোচনাটি যার কাছে যেমনই লাগুক, লেখাটি নতুন আড্ডারুকে সকলের কাছে দ্রুত পরিচয় করিয়ে দিল। একে তো নতুন শিঙ গজিয়েছে মাথায়, তার ওপর [জীবনের প্রথম কোনো [সম] আলোচনা, তাই পাণ্ডিত্য জাহিরের কোনোরকম কসুরই করা হয়নি সেখানে। মাহবুব লীলেন আর জফির সেতুর গল্পে পরাবাস্তব জাদুবাস্তব খোঁজার চেষ্টা করা হলো, আর নিজে যেহেতু নতুন পথ খুঁজতে গিয়ে উঁচ-নিচু পাথর ভাঙছি, তাই *গ্রন্থী*র স্বভাবী কবিতাগুলোকে ভালো লাগলেও গতানুগতিক মনে হলো, তবে আহমদ মিনহাজ আর নাসিমুল হকের প্রবন্ধ দুটিকে এন্তার তারিফ না করে পারা গেল না। কিন্তু যাই করি, দেখলাম বন্ধুরা, হয়ত কনিষ্ঠ আর নতুন পরিচিত বলে, উপভোগই করলেন, শুধু গল্পের আলোচনায় পরাবাস্তব আর জাদুবাস্তবকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি বলে এক গল্পকার কিছুটা অনুযোগ করলেন, আমিও মৃদু তর্ক করলাম। কিন্তু প্রতিক্রিয়া সেখানেই শেষ নয়, কিছুদিন পরে কে যেন বলল যে কবিতাপর্বের আলোচনায় কবি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন, আমি শুনে ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ শুনেছি দ্বিতীয় দফায় আবার তাঁর ভাবে ও আচরণে সিজেফ্রেনিয়ার লক্ষণ

প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আমি তাঁর কবিতায় ছন্দ-ঔদাসীন্য অথচ অহেতু অন্ত্যমিলপ্রয়াসী প্রবণতার সমালোচনা করেছিলাম, কিন্তু আমার সৌভাগ্য যে তার কয়েকদিন পরে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সময় এ-বিষয়ে কিছুই বলেননি। আমি যা বলেছিলাম তা মিথ্যা নয়, সংখ্যাটি এখন সামনে থাকায় তার সত্যতায় এখনো আমি অবিচল, কিন্তু এরপরও তাঁর রাগ করার মতো কিছু যুক্তি ছিল, কারণ সে-সংখ্যার চারটি কবিতার মধ্যে 'মানুষের পতনের পরওম্ব কবিতায় একটি স্তবক ছিল যেটি দ্রুত পঠন/লিখনজনিত কারণে আমার চোখ এড়িয়ে যায়, যা ঠিকই ধরা পড়ে [তখনই কী এক আলোচনার কারণে আড়ালে কারও-কারও মুখে 'টি এস এলিয়ট' নামে সম্বোধিত] টি, এম আহমেদ কায়সারের চোখে। একদিন তারই কণ্ঠে শুনি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ারের এই অসাধারণ স্তবকটির আবৃত্তি:

ক্ষয়ে যেতে যেতে আকাশে তাকালে
আকাশ করুণা করে
মানুষের মতো, মানুষ করে না,
ভাগ্যতারা বিরূপ তারকার
শেষ দীর্ঘশ্বাস শোনে
মৃত্যুর ধ্বনিতে।

স্তবকটি শুনে ও পড়ে নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হয়েছিল। এই কারণে তো অবশ্যই, এবং তাঁর সৌজন্যের জন্যও, তাঁর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি, ক্রমশ সেই আগ্রহ শ্রদ্ধায় পরিণত হল, যেদিন হাতে এল *শুদ্ধস্বর*-এর পঞ্চম সংখ্যাটি। এই আড্ডায় নতুন শরিক-হওয়া আমার জন্য সংখ্যাটি নিয়ে এল দুটি নতুন সংবাদ : কিশওয়ারকে নিয়ে একটি ক্রোড়পত্র আর পত্রিকার স্বঘোষিত মৃত্যুসংবাদ, যা তখনই আমার কাছে ছিল সাড়ম্বর আত্মহত্যার শামিল। *শুদ্ধস্বর*-এর সূচিপাতার আগেই '*শুদ্ধস্বর* আরো বের হলে এগুলোও প্রচ্ছদ হতে পারতো' এরকম বিষণ্নকর শিরোনামে ছাপা হলো আরও দুটি ছবি, যার একটির চিত্রকর ছিলেন হেলাল আহমদ চৌধুরী; আর সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়েছিল : 'ব্যক্তি আমার জটিল ব্যস্ততা, সময়ের সাথে আপোষ, চর্চার স্থবিরতা– এসব কারণে শিল্প ও সাহিত্যের সাথে প্রতারণা করার সুযোগ হাতে আসার আগেই স্বেচ্ছামৃত্যুর এই করুণ ঘোষণা দিতে হলো। শিল্পের বিকল্প মৃত্যু ছাড়া আর কী হতে পারে?'
শুদ্ধস্বর মৃত্যুসংখ্যার অভিঘাত লেখক-বন্ধুদেরকে কিছুদিনের জন্য বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন করে ফেললেও পরে তারা সকলেই যার যার কাজে লেগে গেলেন। শামীম শাহান আবার শুরু করে দিলেন *এস্থী* দ্বিতীয় সংখ্যার কাজ, তবে *শুদ্ধস্বর*-এর স্বেচ্ছামৃত্যুর বিষণ্নতা বা আবিষ্ঠতা যাই বলি না কেন, তা

যে পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল *গ্রন্থী*র দ্বিতীয় সংখ্যার সূচিতে, *শুদ্ধস্বর* প্রকাশের প্রস্তুতিকাল ও মৃত্যুঘোষণার নেপথ্যকথা নিয়ে আহমেদুর রশীদের সংবেদনময় স্মৃতিচারণ : 'সেই সুর বাজে অকারণ।' হয়ত *শুদ্ধস্বর*-এর সম্পাদকীয় কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হননি শামীম শাহান, তাই তাঁকে দিয়ে আরেকটি গদ্য লেখালেন, অথবা, হয়ত আহমেদুর রশীদ নিজেই লিখলেন দরদি লেখাটি, যেখানে ছিল এমন স্বীকারোক্তিও : 'একসময় গোলাম আযমের নাম শুনলে যে আমার শ্রদ্ধা উথলে উঠত, সেই আমি এখন ভাবি ইশ কেন যে জাহানারা ইমামের ছেলে হয়ে জন্ম নিলাম না।'

এই লেখাটি ছাড়াও *গ্রন্থী*র দ্বিতীয় সংখ্যায় আরও নতুনত্ব ছিল বেশ, ছিল 'আর্ট গ্যালারি' বিভাগে শিল্পী হেলাল আহমদ চৌধুরীর আটটি চিত্রকর্ম, তার মধ্যকার একটি 'ধান উয়ানি' ছবিটির কথা এখনো চোখে ভাসছে। ছিল এ কে শেরামের মণিপুরি কবিতার অনুবাদ, এর আগে বাংলাদেশের কোনো ছোটকাগজে মণিপুরি কবিতার অনুবাদ ছাপা হয়েছে বলে জানি না। ছিল লিয়াকত শাহ ফরিদী অনূদিত নিখিলেশ্বর জি দেবরাজু মহারাজুর তেলেগু সাহিত্যবিষয়ক একটি প্রবন্ধ, ছিল টি, এম আহমেদ কায়সার অনূদিত নিকো লর্ডকিপানিজের একটি গল্পের সযত্ন অনুবাদ। তিনটি প্রবন্ধ ছিল, এর মধ্যে সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের প্রবন্ধটি ছিল আকারে ছোট, তবু প্রশ্ন-উদ্রেককর এবং যুক্তিগ্রাহী; বাকি দুটি প্রবন্ধ আহমদ মিনহাজ ও নাসিমুল হকের– দুটিই দুই বাংলার বহু নবীন প্রবীণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই মুহূর্তে মনে পড়ল, *গ্রন্থী* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত আহমদ মিনহাজের 'ক্রান্তি পথের যাত্রী' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধটির কথা, যেটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই খোন্দকার আশরাফ হোসেন তাঁর বিখ্যাত একবিংশ পত্রিকায় 'তোমার সৃষ্টির পথ' নামে পুনর্মুদ্রণ করেন। অনুপম-এ উঠব বলে রাজা ম্যানশনের বাঁ দিকের ভেতরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেওয়ার আগে এই সংবাদটি যখন মিনহাজ আমাকে জানান, তখন ভীষণ আলোড়িত হই এবং তথ্যটি সর্বত্র প্রচার করতে একঘন্টা সময়ও নিইনি, মনে পড়ে এই আনন্দ আমরা অনেকে মিলেই উদ্‌যাপন করেছিলাম। আরও পরে হাবিবুর রহমান এনার সম্পাদিত খোয়াব-এ প্রকাশিত বাউল-ফকির বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লোকতাত্ত্বিক সুধীর চক্রবর্তী ধ্রুবপদ-এর বাউল-ফকির সংখ্যায় পুনর্মুদ্রন করেন, যা ছিল আমাদের সকলেরই জন্য আনন্দসংবাদ। [মিনহাজ এখন নিয়মিত গল্প ও উপন্যাস লিখছেন, যা ইতোমধ্যে গুণগ্রাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এবং লিখছেন ইংরেজি ভাষায় নিজস্ব ব্লগে নানা বিষয়ের প্রবন্ধও, কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রবন্ধে অনিয়মিত। মিনহাজ যা-ই লিখবেন তা যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসহ প্রকাশিত হয়, তা তাঁর পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন, কিন্তু তাঁর বাংলা প্রবন্ধ পড়বার জন্য এখনো যে পাঠকেরা অপেক্ষা করেন, এ-কথাটি এই সুযোগে না জানিয়ে পারলাম না।]

*গ্রন্থী*র কপিগুলো ধীরে ধীরে নানা জায়গায় যখন পোস্ট করছি, এবং প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি, এরই মধ্যে

একদিন শামীম শাহান বললেন, হেলাল আহমদ চৌধুরীর *ফিনিক* বের হবে, কিন্তু তিনি তখন চট্টগ্রামে, সম্ভবত মাস্টার্স পরীক্ষা সামনে, তাই সিলেটে আসা সম্ভব নয়; এদিকে আমারও ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল সামনে, তবু পরীক্ষার প্রস্তুতি চাঙে তুলে শামীম শাহান আর আমি *ফিনিক*বিষয়ে যৌথ পরিকল্পনার জন্য এক ভোরে চট্টলাগামী ট্রেনে চড়ে হেলাল ভাইয়ের মেসবাড়িতে গিয়ে উঠলাম, কারণ তখন বন্ধুদের সকল পত্রিকাই ছিল আমাদের নিজের পত্রিকা। এদিকে একই সময়ে প্রস্তুতি চলছিল আনাসামি অর্থাৎ [টি, এম] আহমেদ কায়সার, নাসিমুল হক, সারওয়ার চৌধুরী ও [আহমদ] মিনহাজ সম্পাদিত প্যারাডাইম-এর প্রথম [ও শেষ] সংখ্যার, পরে বের হবে শাহ শামীম আহমেদের *হৃদি*, লিয়াকত শাহ ফরিদীর *নির্ব্যাজ*, হেলাল উদ্দিন সবুজের *নদীপাখিমেঘ*; বিশ্বনাথ থেকে ফজলুররহমান বাবুলের *ঋতি*; আরও পরে হাবিবুররহমান সম্পাদিত *খোয়াব* ও নাজমুল হক নাজু সম্পাদিত *ঘাস*সহ আরও কিছু কাগজ। *গ্রন্থী*র মতো অন্য সব কটি কাগজেরই রয়েছে পৃথক পৃথক গল্প, তার উল্লেখ আজ এ লেখায় অপ্রাসঙ্গিক, শুধু এ-সূত্রে একথাটাই বলা প্রাসঙ্গিক যে, নব্বইয়ের শেষের দিকে এসে শামীম শাহান কী কারণে জানি না একটু সরে গেলেন! আক্ষরিক অর্থেই আমাদের রাস্তা এক ছিল বলে সপ্তাহে একাধিক দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, প্রবাসী হওয়ার আগে কিছুদিন দূরের কোনো কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন, ছাপার ব্যবসাও খুলেছেন, সেখানেও গিয়েছি, বহু বিষয়ে আলাপ করেছি, *গ্রন্থী* তখন শিবনারায়ণ রায়ের উপস্থিতিতে *লিরিক*-সম্মাননাও পেয়েছে, কিন্তু আর পত্রিকা বের করেননি। শুধু *গ্রন্থী*র কথাই বা কেন, এরপর নব্বইয়ের পত্রিকাগুলোকে তো আমরা গত শতাব্দীতেই সযত্ন রেখে এসেছি, আর একুশ শতকে এসে আমরাও ভিন্ন নামে পত্রিকা বের করেছি, অন্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। আসলে নব্বই ছিল [প্র]সঙ্গ আর [আ]সঙ্গলিপ্ততার দশক, আর একুশ শতকের এই দশক দুটি নানা যূথবদ্ধতা সত্ত্বেও কেমন যেন নিঃসঙ্গতার দশক,– এখানে সকলেই প্রত্যেকে একা; এখনকার পত্রিকার প্রকৃতি পালটেছে, পরে আরও পালটেছে, পালটে-যাওয়া হাওয়াই কাগজে মাঝেমাঝে আমরাও লিখছি এবং লিখবও বটে, কিন্তু কেন যেন ছুঁতে পারি না বলে অশরীর মনে হয়, ঠিক আশ মেটে না, অর্থাৎ বন্য শূকর কাদা খুঁজে পায় ঠিকই, মাছরাঙা কাঙ্ক্ষিত মাছও পেয়ে যায়, কিন্তু শান্তি মেলে না। ক্ষমা করবেন জীবনানন্দ, শান্তি আপাতত অকল্যাণ হয়ে আছে; ভবিষ্যৎ কল্যাণময় হবে, এই আশায় দধিভা– হাতে তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ফ কি র ই লি য়া স

সিলেটে সাহিত্য আড্ডা ও আমাদের গ্রন্থীকাল

দীর্ঘদিন বিদেশে থাকি। কবি শামীম শাহানের সাথে আমার পরিচয় আমেরিকায় থাকা কালেই। তার সম্পাদনায় 'অসীমের সন্ধানে' লিটল ম্যাগাজিনটি আমার বেশ কিছু কবিতা ছাপে। কপি আসে নিউইয়র্কে। আমি আপ্লুত হই।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে আমি দেশে যাই। শাহানের সাথে দেখা হয়। আড্ডা হয়। তার সাহিত্যপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করে। ১৯৯৩ সালেই শামীম শাহানের সম্পাদনায় *প্রজন্মের সেতুবন্ধন* নামে একটি কবিতা সংকলন বের হয়। সিলেটে এটাই ছিল নবীন-প্রবীণ কবিদের কবিতা নিয়ে প্রথম একটি বড় কাব্যসংকলন। গ্রন্থটি ব্যাপক আলোচিত হয় সুধী পাঠক মহলে।

সিলেটে ১৯৯৩ - ১৯৯৪ সালে একটা চমৎকার সাহিত্য আড্ডার পরিবেশ গড়ে উঠে। এ সময়ে মনির উদ্দীন চৌধুরী সম্পাদিত *সাপ্তাহিক অনুপম* কার্যালয় হয়ে উঠে আমাদের আড্ডাস্থল। এর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন, কবি সারওয়ার চৌধুরী। এই আড্ডায় যারা প্রায় নিয়মিত হাজির থাকতেন তারা হচ্ছেন - আহমদ মিনহাজ, জফির সেতু, শামীম শাহান, মাহবুব লীলেন, শাহ শামীম আহমেদ, শাহ তোফায়েল, বাইস কাদির, টি এম আহমেদ কায়সার, মোস্তাক আহমাদ দীন, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, ফয়জুর রহমান ফয়েজ, কাদির মুরাদ, জগলু চৌধুরী, ফজলুররহমান বাবুল, পারভেজ রশীদ মঙ্গলসহ আরো অনেকেই ।

মাঝে মাঝে আসতেন, সৌমিত্র দেব, শুভাসিস সিনহা, আহমাদ রাশীদ(পরে আহমেদুর রশীদ নাম ধারণ করেন) প্রমুখ।

মাশুক ইবনে আনিস থাকতেন জল্লারপার রোডের একটি আবাসিক হোটেলে। সেখানেও হয়ে যেতো মাঝে মাঝে আড্ডা। আশির দশকের শেষ দিকে সিলেটের ছড়া সাহিত্যকে যারা এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন, মাশুক ইবনে আনিস এদের একজন। প্রয়াত শারিক শামসুল কিবরিয়া, মাহবুব লীলেন, রেজওয়ান মারুফসহ *সাপ্তাহিক ফেঞ্চুগঞ্জ সমাচার*কে ঘিরে যে সব ছড়াকার নিয়মিত আড্ডা দিতেন - তারা পরবর্তী সময়ে কবিতা,গল্প লিখতেও শুরু করেন।

একজন লেখকের লেখালেখির বিন্যাস এভাবেই ঘটে।ছড়া লিখেছেন শামসুর রাহমান- আল মাহমুদ-রা ও। তাই কেউ ছড়া লিখলেই তার গায়ে ছড়াকার লেবাস লেগে গেলো, এমন কোনো সীমাবদ্ধতার ব্যাকরণ কোথাও লিখিত নেই।

সিলেটের সাহিত্য আড্ডায় যারা আড্ডা দিতেন, তারাই যে সবাই পুরোধা ছিলেন, তা আমি বলছি না। তবে তারা সিলেটের সাহিত্য অঙ্গন কে শাণিত করেছিলেন সে সময়, তা অস্বীকার করার

কোনো উপায় নেই।

কেউ কেউ হয়তো মফস্বলে থেকে নিজেকে *ইনট্যালেকচুয়েল পোয়েট* ভাবার দাবী সে সময়ও করছিলেন। কিন্তু তাদেরকে সামনের সারিতে এসে সাহিত্যের ভাব আদানে কখনও দেখিনি। অবশ্য সবাই সামনে আসতে পারে, কিংবা সামনে আসতে হবে - তেমন কোনো কথাও নেই । তবে দায়িত্ব নিয়ে লেখালেখির একটা বোধ তো থাকা উচিৎ। আর যাদের সেই বোধ নেই কিংবা যারা ছদ্মনামে দূরে থেকে নিজেকে পরখ করার অপচেষ্টা করেন, সাহিত্যে তারা সৎ কি না তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

১৯৯৩-৯৪ সালে আমি কয়েকবার লন্ডনে যাওয়া আসা করি। এই সুযোগে লন্ডনের বাংলা পত্রিকার সাথে আমি সিলেটের কবিদের একটা সেতুবন্ধন তৈরির প্রয়াসী হই। সেই বিবেচনায়, আমি শাহ শামীম আহমেদ, শাহ তোফায়েল, শামীম শাহান, মাহবুব লীলেন, জফির সেতু প্রমুখের বেশ কিছু কবিতা নিয়ে এসে লন্ডনের সাপ্তাহিক সুরমা, জনমত, নতুন দিন, পুর্বদেশ ইত্যাদি কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করি।

সে সময়েই লন্ডন প্রবাসী না হয়েও (অবশ্য এখন তিনি ইংল্যান্ড অভিবাসী) বিলেতে কবি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেন, কবি শাহ শামীম আহমেদ। এমনও দেখা গেছে একই সাথে কয়েকটি সাপ্তাহিকে তার কবিতা ছাপা হয়েছে লন্ডনে। ফলে তিনি আসলে *লন্ডনী* কি না সে প্রশ্ন করেছেন আমাকে অনেকেই।

১৯৯২ -১৯৯৪ সালে সিলেটে লিটল ম্যাগ প্রকাশের একটা প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। আহমেদুর রশীদ সম্পাদিত *শুদ্ধস্বর*, শামীম শাহান সম্পাদিত *গ্রন্থি*, মোস্তাক আহমাদ দীন সম্পাদিত *বিকাশ*, ফজলুররহমান বাবুল সম্পাদিত *ঋতি* , শুভেন্দু ইমাম সম্পাদিত *শিকড়* ও *পাঠকৃতি*, শাহ শামীম আহমেদ সম্পাদিত *হৃদি*, মাশুক ইবনে আনিস সম্পাদিত *কাকতাড়ুয়া* ইত্যাদি অন্যতম।

এই সময়ে একজন তরুণ কবি তুষার সাখাওয়াত এর জন্ডিস আক্রান্ত হয়ে অকাল মৃত্যু সিলেটের সাহিত্য অঙ্গন কে খুবই শোকাহত করে। তার আত্মার শান্তি কামনা করে তারই একটি কবিতা তুলে দিচ্ছি এখানে।

চাবুক

তুষার সাখাওয়াত

কথার চাবুক কত যে তীক্ষ্ণ
স্নায়ু বিদ্ধ করে
রক্তাক্ত করে বুক ।
রক্তের রুদিত ধারায়

প্রেমাংশু চুষে রক্ত
- চুষে চাবুক।
ব্যথাতুর হৃদয় ক্ষত চায়,
আরো দেবে?

লক্ষ যোজন পূর্ণ হবে
তৃষিত হবে চাওয়া
গুলি লাগা পাখি
ডানা ভাঙা কষ্টে
খোঁজে ফেরারী হাওয়া ।

এই নবীন কবির সাথে আমার ও আড্ডা হয়েছে কয়েকবার। তার ধীশক্তি আমাকে আকৃষ্ট করেছে বার বার ।

সাহিত্য এমন কোনো ক্ষেত্র নয় যে, জোর করে নিজের স্থান দখল করা যায়। কেউ কেউ আছেন, তারা মহাকালে বিশ্বাস করেন না।

আচ্ছা, কেউ যদি এখন বলে, সুনীল গাংগুলীর বর্তমান কোনো লেখা , লেখাই হচ্ছে না - তবে তাকে মূর্খ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

আমি তাদেরকে সুনীলের সাম্প্রতিক প্রকাশিত বড়গল্প *কীর্তিনাশার এপারে ওপারে* আর কিছু মানুষের পচন ধরে চোখে। তারা অনেক কিছুই দেখে - না দেখার ভান করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ধীশক্তি সম্পন্ন পড়ুয়ার বড় অভাব। তালি বাজিয়ে কারো গলায় মরমীবাদের মালা দিয়ে দিলেই উনি 'মহান মরমী' হয়ে যান না। যেতে পারেন না।

এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যাক। নব্বই দশকের কবিদের অন্যতম একজন মোস্তাক আহমাদ দীন। দীনের সাথে আমার যেদিন প্রথম সিলেটের রাজা ম্যানশনের একটি পুস্তক বিপণীতে দেখা হয়, সেদিনই আমি অনুধাবন করতে পারি, দীন একজন প্রখর চেতনাবাদী কবি। দীন কথা বলতেন কম। লিখতেন খুব মেপে মেপে।

১৯৯৪ সালের দিকেই বাংলাদেশের লিটল ম্যাগ অঙ্গনে দীন তার নিজস্ব জায়গা করে নেন। এর পর আর তাকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

মোস্তাক দীন এর প্রথম বই বের হয় ২০০১ সালে। *কথা ও হাড়ের বেদনা*। এবং বইটি ঐ বছরেই *দৈনিক প্রথম আলো*'র বিবেচনায় *শ্রেষ্ট দশ সৃজনশীল বই* এর তালিকায় স্থান করে নেয়।এই যে পাওয়া, তা সম্ভব একজন প্রকৃত কবির পক্ষেই ।

সিলেটের সাহিত্য অঙ্গনকে ৯০- ৯৬ সময়ে আরো বেশ কিছু লিটল ম্যাগ আলোকিত করেছে।

এর মধ্যে এ মুহূর্তে আরো যেগুলোর কথা মনে পড়ছে, সে গুলো হলো - আহমদ মিনহাজ, টি এম আহমেদ কায়সার, নাসিমুল হক নিপু, সারওয়ার চৌধুরী সম্পাদিত *প্যারাডাইম*, নাজমুল হক নাজু সম্পাদিত *ঘাস*, লিয়াকত শাহ ফরিদী সম্পাদিত *নির্ব্যাজ*, আব্দুল মমিন মামুন সম্পাদিত *স্বকাল*, হাবিবুর রহমান এনার সম্পাদিত *খোয়াব*, মোস্তাক আহমাদ দীন সম্পাদিত *মুনাজেরা*, পুলিন রায় সম্পাদিত *ভাস্কর*, শ্যাম সুন্দর দে রাধেশ্যাম সম্পাদিত *ভিন্নায়ন* ইত্যাদি । এসব সম্পাদকের ভূমিকা খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই ।

সিলেটে সে সময়ে যে শক্তিটি খুব বেশী প্রধান ছিল, তা হচ্ছে পারপরিক সম্মান। কবিদের মাঝে সৌহার্দ্য ছিল। আড্ডা ছিল প্রাণবন্ত। যা থেকে উপকৃত তো বটেই, ভাব আদানের মাঝে জানা যেতো চেতনার বলয়কে।

মনে পড়ছে সে সময়ে মতিউর রহমান চৌধুরী সম্পাদিত দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সিলেটে আসেন কবি মহাদেব সাহা ও নির্মলেন্দু গুণ। আমরা ক'জন তাদের সাথে চুটিয়ে আড্ডা দিই । এ সময়ে গুণ দা আমাকে একটি লেখা লেখার প্রস্তাব করেন । আমি একটি লেখা লিখি; *সিলেটে সাহিত্য আড্ডা* শিরোনামে।

সিলেটের সেই সাহিত্য আড্ডা থেকে একঝাঁক লেখক উঠে এসেছেন ৯০ এর দশকি পরিচয়ে। জফির সেতু, মোস্তাক আহমাদ দীন, মুস্তাফিজ শফি, শুভাশিষ সিনহা, আহমদ মিনহাজসহ অনেকেই আজ প্রতিষ্ঠিত লেখক। সারওয়ার চৌধুরী, শামীম শাহান, মাহবুব লীলেনরা বিদেশে থাকায় অনেকটাই মৌন হয়ে পড়েছেন তাদের পাঠক সমাজের কাছে।

লিয়াকত শাহ ফরিদী, হেলাল উদ্দিন রানা, ইখতিয়ার উদ্দিন, ফতেহ ওসমানী, কাজী হেলাল এমন অনেক তুখোড় আড্ডাবাজও মিশেছেন আমাদের সাথে। আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি- কথা আর আড্ডার মাধ্যমে অনেক বিষয়েই মতের দূরত্ব কমিয়ে আনা যায়।

সিলেটে এই ২০১৮ সালের প্রথম পাঁচ মাসে দুইবার যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে। না- সেই আড্ডা আর নেই। এখন যারা কবিতা লিখেন কিংবা সাহিত্যচর্চা করেন- তাদের পঠন-পাঠন বড় দূর্বল।

শামীম শাহানের সম্পাদনায় *গ্রন্থী*র দুটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। তিনি একটি লেখায় আমাদের আড্ডার সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন। যা আজকের পাঠকের জানা-পড়া খুবই দরকার।

আমরা যারা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি, তাদের একটা নাড়ীর সংযোগ আছে সিলেটের সাথে। আমরা সেই স্মৃতি নিয়েই থাকি। থাকি, সাহিত্যের আবহে ফেলে আসা দিনগুলো মনে রেখে।

কারণ মানুষ তার জীবনের সৃজনশীল দিনগুলোকে কখনও ভুলতে পারে না।

মা হ বু ব লী লে ন

কবিতাখোর

নিজের থাইকা অর্ধেকেরও কম বয়স আছিল আমাদের; সেইটা এখন ইস্কুলি গণিতে দুর্ধর্ষ আছিলামের মতো একটা ভড়ং কিংবা পাঠ্যবইয়ের পাতায় এক পায়ে খাড়ায়া থাকা তালগাছের মতো ভাঙাচোরা কবিতার স্মৃতি। মনে হয় যেন কোনো এক বইয়ের পাতায় আঙুল দাগায়া মুখস্থ করছিলাম যে এককালে বয়স খুবই কম আছিল আমাদের...

অদ্ভুত ব্যাপার হইল আমার সেই মুখস্থ বিদ্যা শুইনা আরো অনেকেই কয়- হ হাছাই তো। বয়স তো বহুত কম আছিল কোনো এক কালে...
সকলেই ভিন্ন গ্রামের ভিন্ন ইস্কুল পাশ দিলেও কেমনে যেন আমাদের সকলের পাঠ্যবইয়ে একই কবিতা ছাপায়া দিছিল কেউ...

মাঝে মাঝেই মনে হয় এককালে বয়স কম থাকার গল্পটা হয় কোনো রূপকথা না হয় একটা কবিতার কাল...

কবিতা বোধহয় তখনো লিখতাম না আমরা; তবে বিশ্বাস করতাম আমরা কবিতা লিখি আর সেইটা প্রমাণের লাইগা দিচ্চার পর দিচ্চা কাগজ ভরাইতাম বিবিধ বাক্য দিয়া। সেই বাক্যগুলা ক্ষিদা কিংবা দুঃখ প্রকাশের মতো ব্যাকরণ অনুগত বাক্য না; সেইগুলা আঁকাবাঁকা; প্রতিটা বাক্যের প্রতিটা বাঁকের একেক পিঠে একেক রং। মানে শব্দ দিয়া রংমিস্ত্রির কাম; আর সেই রংগুলা কোনোমতে দানা বান্ধাইতে পারলে রং দিয়াই তুইলা দিতাম একেকটা দালান। তারপর নিজস্ব নগর এবং একেকটা জগত...
সত্যি সত্যিই একেকটা জগতের মালিকানা আছিল আমাদের। সেই জগতগুলা নির্মাণের লাইগা বহু দূর বহু শতাব্দি আগে অন্য কারো তৈয়ারি শব্দের খনিগুলায় ডুব দিয়া আমরা তুইলা আনতাম কলা কৌশল; কিংবা বানাইতাম সেইগুলা থাইকা ভিন্ন নিজস্ব নগর; কিংবা স্রেফ দেখতে যাইতাম এমন কী বানাইছে ব্যাটারা যা এখনো আমার মাথায় খেলা করে নাই...

সেইগুলার নাম বই; মইরা যাবার পরেও নিজের কথা অন্যের কানে অনর্গল বকবকানি কইরা যাবার যে কৌশল; সেইটারে কয় বই। আমরা আছিলাম বইয়ের ধান্দাল...

জীবনরে হাতায়া পড়ায়া রাখার পরেও কুত্তার কামড়েই তো কত গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ তামাদি হইয়া যায়। আর স্রেফ মশার কামড়ে জগতের কত বালছিড়া যে কব্বরে হান্দায় তার তো কোনো হিসাব রাখে না কেউ...
সুতরাং মইরা যামুতে অসুবিধাও নাই আপত্তিও নাই কিন্তু বকবকানি চলিবে অনন্তকাল...
বই তৈয়ারি হইবে আমাদের হাতে। বইগুলা সংরক্ষণ কইরা রাখবে আমাদের মনোজগতে তৈয়ারি মানচিত্র ও ভূগোল...
এই একটা বিষয় ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কোনো একমত আছিল না আমাদের মাঝে
বাকি সব বিষয়েই আমাদের সকল সম্মিলনই আছিল হাউকাউ। মাইনসে কইত বিতর্ক। আমরা কইতাম আড্ডা...

আমাদের সেই কবিতা কালের আড্ডা; লেখার আগে একটা উচ্ছন্ন সমাবেশের ভিত্রে সবাইরে জড়ো কইরা আমাদের শিখাইছিল পড়তে...

শহরটা সিলেট। তখনো সেই শহরে মোটর সাইকেল চালাইতে হেলমেট পরার আইন চাপে নাই। তখনো রাত্তির বেলা শহরে শিয়ালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। তখনো সেই শহরের রাস্তায় প্রতি পাঁচ মিনিটে অন্তত একজন পরিচিত পাওয়া যায়। এবং তখনো প্রেম করার লাইগা শহরটা যথেষ্ট ছোট...

এবং তখনো দেশের মানুষ নির্বাচন দেখে নাই বইলা গণতন্ত্রের নামে রক্ত বেহুশ। এবং তখনো মানুষ বিশ্বাস করত একবার স্বৈরাচার খেদানো গেলে আর কোনোদিনও আসবে না...
নব্বইয়ের দশক। কেউ ইস্কুল ছাইড়া কলেজ। আর কেউ কলেজ ছাইড়া ভার্সিটির পয়লা সিঁড়িতে...

ঘোরতর সেই মফস্বল শহরটা আমাদের কবি বানায়া দিলো; অন্তত আমরা তাই ভাবতাম...

আমাদের সেইসব কবিতা ছাপাইতে আমাদেরই কেউ কেউ হইয়া উঠে সম্পাদক। ছোট ছোট কয়েক পাতার ম্যাগাজিনের নির্ধারিত সম্পাদক; সারা দুইন্নারে দেখাইবার লাইগা আমরা সেইসব দুই শো তিনশো কপি ছাপা হওয়া ম্যাগাজিনে লিখতাম...

ধীরে ধীরে আমরাও বড়ো হই; ম্যাগাজিনগুলাও বড়ো হয়; আমারাও শুধু কবি থাইকা চরিত্র বদলাই। বাক্যের গঠন বদলায়। মলাটে নিজের নাম ছাপানো একাধিক বইয়েরও মালিক হইয়া

পড়ি কেউ...

এককালে পূর্ণকালীন কবি থাইকা ধীরে ধীরে ভাতুয়া সমাজের দিকে আগাইতে আগাইতে আমরা কেউ কবিতা ছাড়ি; কেউ বার্ষিক অনুষ্ঠানের মতো লটকায়া রাখি আবার কেউ ঝুইলাই থাকি কবিতার শব্দমালা ধইরা...
পড়া কমে আমাদের। আমাদের পাঠ্যসূচিতে ঢুইকা পড়ে চাকরির বিজ্ঞাপন কিংবা ইনকামট্যাক্স রিটার্নের ফাইল কিংবা ডাক্তারখানার হাগুমুতুরক্ত পরীক্ষার ফলাফলের পাতা...

আমরা স্বতন্ত্র হই। আলাদা হই। ছড়াই; দেখা হয় না আর কারো লগে কিন্তু সেই আড্ডায় শানানো প্রখরতাগুলা সর্বদাই আমাদের ভাতুয়া জীবনের লগে লগে থাকে ভর্তার মতো...

তো সেই আমরাটা কারা?
কেউ না। স্রেফ একটা প্রজন্মের কবিতা করা মানুষ। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নামধাম আছে কিন্তু কিন্তু গদ্যবাংলায় সেই নামগুলা কওয়া মুশকিল। কারণ নাম নিতে গেলেই নাম আগেপরে হয়; কারোটা বাদ যায়। কিন্তু কবিতার কবিতার কাল থিকা কারো নাম বাদ দিবার কি অধিকার ধরে কেউ?
না। অন্তত আমি বলি না...
এর বাইরেও একটা ঝামেলা আছে। বন্ধুবান্ধবগো মাঝে কোনো একজনরে নিয়া খুব নিরাপদে কথা কওয়া যায় যদি সেই দোস্তটা মইরা যায়। কিন্তু বন্ধুগো জিন্দা থুইয়া দুই একজনরে নিয়া কথা কইলে অন্য দোস্ত কষ্ট পায়- আমার নামটাও নিলো না হারামজাদা...

একই কাণ্ড ঘটে বন্ধুগো কারো কোনো কর্ম নিয়া কথা কইতে গেলে। এই যে লিটল ম্যাগাজিন; আমাগো বন্ধুরাই বেগার খাইটা সেইগুলা বাইর করত বইলা নিজের অলেখা কুলেখা ছাপাইতে পারতাম নিজেরা; সেইগুলার যদি খালি একটার নাম নেই; তো আরেকজনে কোনখানে যে ফুইলা পটকা মাছ হইব কেডা জানে...

নাম না নেই কারো

দুনিয়ার একেকটা কোনায় একেকজন ছড়াইয়া পড়লেও যেই সূত্রগুলা আমাদের অখণ্ড সময়টারে একটা সুতায় আটকায়া রাখছে এখনো; *গ্রন্থী* সেইগুলার একটা। আমাদের সেই রূপকথা কিংবা

কবিতা দিনের এক স্মারক *গ্রন্থী* ...

গ্রন্থী এইবার নব্বই দশকের সিলেটরে ফিরাইয়া আনতেছে লন্ডনে। নাকি আমাদের কবিতাকালীন বয়সটারেই ফিরাইয়া আনার কোনো ধান্দা আছে *গ্রন্থীর*?

যদি হয় তবে আবারো কান্ধের ঝোলায় হাত ঢুকাইয়া আমিও বাইর কইরা আনতে পারি এক বান্ডিল কবিতার পাতা; লন গো সম্পাদক সাব; ছন্দমন্দ বুঝি না কিন্তু হার্টবিটের তালের লগে মিলায়া শব্দের রংগুলারে গাঁইথা দিছি বাক্যের মালায়; এরে আমি কবিতাই কই; আপনে যদি এর লগে একমত না হইতে পারেন তয় কোনো জাহান্নামে গিয়া আঙুল চোষেন...

আহমেদুর রশীদ টুটুল

আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ

একটু পেছন ফিরে তাকালেই অনুভব করি সেই অকারণ সুর এখনও বাজে। এখনও হঠাৎ হঠাৎ কোনো কোনো অজানা মূহুর্তে স্মৃতিকাতরতা আমাকে পেয়ে বসে। মনে হয় আমার চোখে ভিআর হেডসেট লাগানো আর একেরপর এক রেকর্ড করা এক পুরোনো দিনগুলো একেবারেই রিয়াল এফেক্ট সহ দেখতে পাচ্ছি এবং আচ্ছন্ন হচ্ছি। আবার মাঝে-মধ্যে নিজে থেকে চেষ্টা করে করে মনে করি, গুগলম্যাপ পরিভ্রমনের মতো করে বেড়াতে যাই। এই স্বেচ্ছাভ্রমও আমাকে কাতর করে, ঘোরের মধ্যে ফেলে দেয়। এই কাতরতা, পরিভ্রমণ আমাকে শেষ পর্যন্ত আনন্দিতই করে। মুঠোর ভেতর পৃথিবীর সব যোগাযোগ ধারণ করেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সকল হাহাকারের বা আনুষাঙ্গিকতার ভেতর দিয়ে আমি এই আনন্দ উদযাপন করি।

আমার স্মৃতিতে ও অনুভবে সেই সময়কালের, সেই ফ্রেমের উজ্জ্বল, অগতানুগতিক, শব্দবাজ চরিত্রগুলোও বিরাজ করে কবিতার সাজানো গদ্য ছন্দের মতো করে। এবং আমি শিহরিত হই এটা ভেবে যে, আমি আজও তাদের কবিতার হোক বা গদ্যের শব্দ- জাদুর অনুগমন করি এবং আস্বাদিত হই। তাদের নানান নিরীক্ষা, আপডেটেড নাগরিক বোধ, রূপকের ব্যবহার, মানবিক বৈপরিত্য এবং কমিটম্যান্ট; সবই আমাকে আক্রান্ত করে আগের মতোই। ভেতরে ভেতরে এখনও আকাঙ্খা কাজ করে; কখনো সুযোগ হলে আমি আবারও সেই চরিত্রগুলোর পিছনে পিছনে পথ হাঁটতে চাই জিন্দাবাজারে বা শাহবাগে, ছাদ ফাটানো আড্ডার পাশে বসে শুনতে চাই তাদের আলাপ, যৌক্তিক দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখতে চাই তাদের চোখের নিচের রেখার পরিবর্তন আর চোয়ালের শৈল্পিক অনুরনণ।

সম্মিলন বা বিচ্ছিন্নতা সবকিছুই তো আপেক্ষিক। কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত কোনো কিছুর জন্য নয়। তবে আমি উপলব্ধি করি কবিতা যেমন এক তুমুল আনন্দযজ্ঞের নাম তেমনি মানুষ, মানবিক মায়ার সহস্র বিহবলতার বিচ্ছুরণ।

টি এম আহমেদ কায়সার

যৌবন ক্ষয়ের সোনাঝরা উপাখ্যান

এ হল কতিপয় জন্মোন্মাদ কিশোরদের আত্ম-মেহনের স্মৃতি!

যারা সাহস নাই বলে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে পারিনি,' ছলনা জানি না বলে আর কোনো ব্যবসাও শিখিনি', প্রেমিকার কাছে প্রকাশ্যে জবাব চাইবার মত বুকের পাঠা ছিল না বলে, ব্যর্থ প্রেমিক, পড়াশোনা ফাঁকি দিয়ে পকেটে কবিতার স্তুপ বয়ে বেড়াই বলে প্রায় বখে যাওয়া উদ্বাসু উন্মুল কিছু কিশোর; ইঞ্জিনিয়ারিং এর ল্যাব ফাঁকি দিয়ে তখন কাফকা, হেস, গ্রাস, ব্রেতো জাবর কেটে বেড়াই, গুণময়, সতীনাথ, আমিয়ভূষন নিয়ে তর্কে, দ্বন্দ্বে, কলহে একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি পর্যন্তও বন্ধ করে দিয়েছি কত কত দিন। মিনহাজের সঙ্গে কেন যেন, সিনেমা সাহিত্য নিয়ে কোনো তর্কেই বুঝি, প্রায় দুবছর কথা বলিনি। চিন্তায়, বোধে পরিণত, ভদ্রতায়ও মহান, মিনহাজ পরে একাধিকবার নিপু সহ বাসায় এসে ব্যাখ্যা চেয়েছে। আজ কেন জানিনা এইসব পাগলামোর কথা ভেবেই খুব সুখ লাগে...

রবীন্দ্রনাথকেও কি ছেড়ে কথা বলেছি? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মস্ত মস্ত সাম্যবাদীদের রবীন্দ্র সমালোচনাগুলো গিলেছি আদ্যোপান্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যাখ্যানের পক্ষে কিছু শক্ত যুক্তি দাঁড় করাব বলে। সম্ভবত *গ্রন্থী* বা *প্যারাডাইম*-এর একটা সম্পাদকীয়তে বা কোনো একটা লেখায় কোথাও লিখেছিলামও, দেশ পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের অমুক তমুকের কাছে পত্রাবলী ও তার ধুলো মলিন আলখেল্লার পকেটে রাখা টিস্যু নিয়ে ক্রোড়পত্রও ছাপাতে পারে, আমাদের সেই দায় নেই, সেই রুচিও নেই ইত্যাদি ইত্যাদি...
আজকাল রবীন্দ্র রচনা পাঠ করতে করতে ভাবি সবার অগোচরে নিজেই কেমন প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছি; এই বিপুল বিস্ময়কর রচনা সম্ভারের সামনে দাঁড়িয়ে গৌরবে ছাতি স্ফীত হয়ে ওঠে...

আমার চাচা ছিলেন ধাতব পদার্থের মানুষ; অফুরান মেধা থাকা সত্ত্বেও কেবল সাধ্যের অভাবে জীবনে তিনি যা যা হতে পারেন নি, সব কিছুই আমাকে হয়ে উঠতে হবে - হাওরে পূর্ণিমা দেখতে গিয়েও এরকম একটা দায়, এরকম একটা অনর্গল অনুজ্ঞা বারবারই তাড়া করে ফিরেছে। আমার এই অর্ধোন্মাদ অবৈষয়িক স্বভাব তাঁকে প্রায়ই বিচলিত করে তুলত। সারা রাত হাওরে পূর্ণিমা দেখে ভোরে বাসায় ফিরলে দূর থেকে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে শিউরে উঠতাম। মাঝেই মাঝেই

বলতেন- বালক, রঙ্গীন চশমা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছো। কিন্তু জীবন তো রঙ্গীন চশমায় দেখা দৃশ্যের থেকেও রঙ্গীন বলে জানি।

চাচা ভাবতেন আমার বন্ধুরাও আমার মত লাফাঙ্গা; জগতের সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজ কাব্য কাসিদা লিখে টগবগে যৌবনের দিনগুলি অপচয় করে চলেছে। ভাবতেন সবাই মিলে নিজেদের সমূহ সম্ভাবনা ধ্বংশ করে দেবার পর এখন আমাকেও ফতুর করে দেবার ফন্দি ফিকিরঁ আটছে। মিনহাজ নিপু, দীনেরা কত কত দিন বাসার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা ...আমার বন্ধুরা, সেই লাফাঙ্গা বন্ধুরা যখন দশ দিগন্ত জয় করে বেড়ান, দু-বছর আগে প্রয়াত চাচার সাথে মনে মনে তর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হই।

নব্বই দশকে সিলেটে যারা নতুন সাহিত্য রচনায় উদ্যোগি হয়েছিলেন, *গ্রন্থী* প্রায় সকলের জন্যে ছিলো একটা উজ্জ্বল প্লাটফর্ম, এমনকি তাদের জন্যেও যারা *গ্রন্থী*তে লিখতে পারেন নি। একটা সত্যিকার সিরিয়াস সাহিত্য আন্দোলনের যাবতীয় সম্ভাবনা উস্কে দিয়েছিল এই প্লাটফর্ম। এই জন্যে প্লাটফর্ম বলছি, কারণ, শুধু প্রকাশনায়ই সীমিত ছিল না এর গণ্ডি। জিন্দাবাজার রাজা ম্যনশনে সাথী লাইব্রেরীতে *গ্রন্থী* কেন্দ্রিক রাতদিনব্যাপী আড্ডা, উপরে অনুপম অফিসে অবিরাম এইসব আড্ডা, তর্ক বিতর্ক আমার ধারণা একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে সিলেটে নব্বই এবং এর পরবর্তীতেও নানারকম নিরিক্ষা ও প্রপঞ্চ রচনায়। বিশেষত সুবিমল মিশ্র পড়ে খানিকটা উত্তেজিত সব তরুণেরা মিলে যেমন কল্পিতা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার আন্দোলন শুরু করেছি, তেমন আবার উত্তরাধুনিক কবিতা গল্প রচনারও সচেতন প্রয়াস চালিয়ে গেছি। *গ্রন্থী* কেন্দ্রিক আড্ডার সূত্র ধরেই পরে কবি ফজলুররাহমান বাবুলের সম্পাদনায় ঋতি, নিপু, সারোওয়ার চৌধুরি, আহমদ মিনহাজ আর আমার সম্পাদনায় বেরিয়েছে *প্যারাডাইম*, হাবিবুর রাহমান এনারের সম্পাদনায় *খোয়াব*, আহমেদ সায়েমের সম্পাদনায় *সুনৃত*, নাজমুল হক নাজুর সম্পাদনায় *ঘাস*।

এক সঙ্গে মাইলের পর মাইল হাঁটার নিয়তি, তুমুল তর্ক, শহরের সব ফাস্ট-ফুডের দোকানগুলি চেখে দেখা ইত্যাদি নানা কারণে আমি, দীন মিনহাজের বুঝাপড়া বোধকরি অন্য আর সবার থেকে একটু আলাদা ছিল। পায়ে হেঁটে আমার বাসা থেকে শাহী ঈদগাহে মিনহাজের বাসা, তারপর উপশহরে লিয়াকত শাহ ফরিদীর বাসা ও দৈনিক বাংলার অফিস, তারপর কুয়ারপার *গ্রন্থী* সম্পাদক কবি শামীম শাহানের বাসা, দীনও কিছুদিন কুয়ারপার, পরে শেখঘাট এবং সব শেষে দরগাহ গেইটে থেকেছেন বলে এইসব বাসায় বাসায় হানা, শুভেন্দু ইমামের সুবিদবাজার ও পরবর্তিতে বাঘবাড়ির বাসায় ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা টগবগে যৌবনের এতসব মূহুর্তের সকলি কি বিফল?

অপচয়? সাথী লাইব্রেরীতে, অনুপমে, বইপত্রে, মাহমুদ কম্পিউটারে, শিল্পকলা একাডেমিতে এত যে যৌবন ক্ষয় করে বেড়িয়েছি, সকলি কি নিজেদের পরাজয়ের গল্প হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে?

গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মন হত ভুল রাস্তায় আসলে অন্য কারো বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছি, দরোজায় নক করে ভেবেছি, আসলে কি অন্য কারো বাসায় এসে করাঘাত করে যাচ্ছি?

এতদিন পরেও এই ইউরোপের রাস্তা ধরে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়শই মনে হয়, ইজ দ্যা লাইফ ডেস্টিনড টু বি ফিউটাইল? মনে হয়, আমি কি আসলে অন্য কারো জীবন কাটাচ্ছি? এখনো অন্য কারো বাসায় এসে করাঘাত করে যাচ্ছি, দরোজা খোলো ...

শামীম শাহান

গ্রন্থী: পুনরুজ্জীবন ও নতুন যুগের ডাক

নানা কারণে, নানাভাবে বিশ্বপরিস্থিতি উত্থান ছিল- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে। রাশিয়া ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। পুঁজিবাদের চূড়ান্ত জয় ঘোষিত হয়েছে। বাংলাদেশেও হয়েছে রাজনৈতিকবাদ পরিবর্তন। ... পৃথিবীর এক নিভৃত কোণে আমরা কয়েকজন তরুণ এক হয়েছিলাম- একটা নতুনের শুভ সূচনায়- কবিতার সাথে বিভোর- উম্মাদ কয়েক তরুণ- আমরা বন্ধু- যোদ্ধা।

কোনো কিছু না বুঝেই আমি একটি পত্রিকা সম্পাদনা করি। পত্রিকাটির নাম- *অসীমের সন্ধানে*। - নেহায়েত কিছু কবিতা, গল্প, ছড়া আর প্রবন্ধ ছিল এতে। পত্রিকাটির সকল লেখকই ছিলেন তরুণ- কারোবা প্রথম লেখা ছাপিয়ে ছিলাম আমি- তবে লেখাগুলো ছিলো দর্পে ভরা- অহংকারী। আর *অসীমের সন্ধানে* প্রকাশের পেছনের একটা শক্তি ছিলো- আমার প্রিয় এক বড় ভাই কবি মাজেদ আহমেদ চঞ্চল। যেটির প্রচ্ছদও তিনি করে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রকাশ করি ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে লেটার প্রেসে। তখনও সিলেটে কম্পিউটারের ছড়াছড়ি তেমন ছিলো না। তারপর সেটিকে মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশ করার ঘোষণা দিলেও পাঁচটি সংখ্যা বের করি। মাসিক *অসীমের সন্ধানে* বেরুনোর পর, আমার মনে হলো, এ রকম পত্রিকা করার কোনো মানে হয় না- কিংবা এরকম গতানুগতিক সাহিত্য ছাপিয়ে পত্রিকার ওজন বাড়ানোর দরকার নেই। এতে সাহিত্যের কোনো লাভ ক্ষতি হয় না।

এই ধারনা মনের ভেতর কেনো জন্মেছিলো, তার পেছনের কথা বলি, সিলেটের বিভিন্ন মফস্বল থেকে শহরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন ক্ষিপ্র তরুণ- যারা পড়াশোনা ছাড়া ভিন্ন কিছু বুঝতো না- লেখালেখির স্বপ্নতে ছিল বিভোর।

তখন সারা পৃথিবীতে সাহিত্য, শিল্প ও দর্শণের সাড়া বড় ধরনের পটপরিবর্তন হয়- বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঞ্চলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তরুণরা। এ খবর আমরা পেয়ে গেছি- পাওয়ার একটাই কারণ - বইপত্র এবং লিটল ম্যাগ।

সিলেটের বইপত্র বলে একটা ব্যতিক্রমী লাইব্রেরী ছিলো, এখানে পৃথিবীর নানা পর্যায়ের সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদের বই আসতো- আসতো কলিকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন মেজাজের সাহিত্য পত্রিকা- এই সব লিটলম্যাগ। আমরা পড়তাম- আর উদ্বুদ্ধ হতাম। একসময়, মনে হয়, গতানুগতিক সাহিত্যচর্চ্চার কেনো মানে নেই- প্রয়োজন নতুন রূপ ও রীতির

সাহিত্যচর্চ্চা। - এভাবেই একদল তরুণের বুদ্ধিবৃত্তির ও সৃজনশীল মনন তৈরি হয়; এবং আমি উপলব্ধি করলাম; এই যে, তরুণরা পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সাহিত্যচর্চ্চা মশগুল হচ্ছেন এবং নতুন ধরনের লেখায় আত্মনিয়োগ করছেন। তাদের লেখা ছাপানোর মতো কোনো পত্রিকাতো আশেপাশে নেই। আর কাছে দূরে যেগুলো আছে তাতে এদের লেখা ছাপাবে কেন?

সত্যি তো কেন ছাপাবে, এইসব আজগুবি (?) কবিতা বা গল্প? এরই মধ্যে আমাদের বন্ধু আহমেদুর রশীদ একটি সংখ্যা বের করেন- *শুদ্ধস্বর*। রীতিমত আমাদের দেখা শহরের সাহিত্যপাড়ার একটা বিষন্ন সাধিত হয়। দেখাগেলো *শুদ্ধস্বর* এমন সব কবিতা, গল্প বা চিন্তামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে, যাতে আমাদের অগ্রজরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এইসব কী সাহিত্যের নামে স্বেচ্ছাচারী? ... আমি নিজেও বন্ধুদের লেখা পড়ে উদ্বুদ্ধ হতে থাকি এবং একসময় স্থির সিদ্ধান্ত নেই- একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা করব। এর লেখক হবো শুধু আমরাই।

১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে আমি বন্ধুদের লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাই। পত্রিকাটির নাম দিই *গ্রন্থী*; নামের মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে। আমরা নিয়মিত যে সব আড্ডায় মিলিত হই, সাহিত্যের রাজা উজির মারি- আমি চাই এসবকে এই পত্রিকার মাধ্যমে একটা 'গিট' দেই- *গ্রন্থী*। আর সত্যি, আমরা বন্ধুরা, আমাকে অবাক করে দিয়ে নিজের যে সব গল্প কবিতা লিখতে চায়, তাই লিখে আমার কাছে জমা দেয়। এবং খুব দ্রত সময়ের মধ্যে *গ্রন্থী* প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করি। প্রথম সংখ্যায় যারা *গ্রন্থী*র যাত্রী হন, সেইসব বন্ধুরা লিখেন-

প্রবন্ধ

আহমদ মিনহাজ/ক্রান্তি পথের যাত্রী

নাসিমুল হক/ বিজ্ঞান: কোয়ান্টাম-ছন্দের ধ্রুপদী সংগীত

গুচ্ছ কবিতা

কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার: মানুষের পতনের পরও / অস্থিত্বে নয়/ তোমার চেয়েও মহা/ সুধীন্দ্রনাথের প্রতি

ফকির ইলিয়াছ: শঙ্খের কুসুম/ দূরের দাঁড়ানো বাতাসে/ সূচনার আদিত্যে দাঁড়িয়ে/ অনাগত

ত্রয়ী কবিতা

শাহ শামীম আহমেদ: শিল্পের অনল/ নিজস্ব নিয়মে আছি স্বরচিত সন্যাসে/ আভূমি বিধ্বস্থ এই দন্ডিত জনপদে

শাহ তোফায়েল আহমেদ: এই নিশ্বাসের উৎসবে/ অনড় দাঁড়িয়ে আছি, দু'হাতে স্বপ্ন-বিষ/ তনের শেষ ধাপ

যুগল কবিতা:

মুস্তাফিজ শফি: রিলিফের শাড়ী/ প্রহরী

ফারহানা ইলিয়াছ তুলি: রৌদ্র ঝরা গান/ শ্রাবণের বৈভবে

অনুবাদ

সৌমিত্র দেব টিটো: সনেট/ ভালোবাসতে দাও

গল্প

জফির সেতু: নিহত মেন্ডোলিন

মাহবুব লীলেন: আর্মাডিলো

চিত্রকলা

হাসান জফির: শিল্পীর দ্রোহ শিল্পীর অঙ্গীকার

সমালোচনা

শামীমা চৌধুরী/ প্রজন্মের সেতুবন্ধন

পাঠ প্রতিক্রিয়া

তানহা রাহমান: কয়েকটি লিটল ম্যাগ (শুদ্ধস্বর, সম্পাদক: আহমাদ রাশীদ; মোহনা, সম্পাদক: শামীম শাহান; চোখ, সম্পাদক: মুস্তাফিজ শফি; মনোজ, সম্পাদক: ফয়জুর রহমান ফয়েজ; ফিনিক, সম্পাদক: হেলাল আহমদ চৌধুরী এবং সাঙ্গ, সম্পাদক: লায়েক আহমদ নোমান।

জার্ণাল

শামীম শাহান: আড্ডা- খুলেছি স্বর্গ দ্বি-প্রহরে।

প্রথম সংখ্যা বেরুনোর পর আশাজনকভাবে কলকাতাসহ সারা বাংলাদেশে, আমি বলব একটা সাড়া পড়ে যায়। আমাকে চট্টগ্রাম, বগুড়া, ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, আসাম, ত্রিপুরা থেকে অনেকেই পত্র লিখেন অভিনন্দন জানিয়ে; *গ্রন্থী*র আয়ুর দীর্ঘতা কামনা করে; এবং লেখা পাঠানোর ছাপার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি দারুণভাবে উৎসাহিত হই।

সে সময়ই বের হয় সিলেট থেকে অনেকগুলো লিটল ম্যাগ এবং সাহিত্য পত্রিকা। হেলাল আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত *ফিনিক;* টি, এম আহমেদ কায়সার, নাসিমুল হক, সারওয়ার চৌধুরী ও আহমদ মিনহাজ সম্পাদিত *প্যারাডাইম;* লিয়াকত শাহ ফরিদী সম্পাদিত *নিব্যাজ;* মোস্তাক আহমাদ দীন সম্পাদিত *বিকাশ;* মুস্তাফিজ শফি সম্পাদিত *চোখ;* শাহ শামীম আহমেদ সম্পাদিত *হৃদি;* নাজমুল হক নাজু সম্পাদিত *ঘাস;* ফজলুররাহমান সম্পাদিক *ঋতি;* শুভেন্দু ইমাম সম্পাদিত *পাঠকৃতি, শিকড়;* আব্দুল মুমিন মামুন সম্পাদিত *স্বকাল;* মুস্তাফিজ শফি সম্পাদিত *চোখ,* মাশুক ইবনে আনিস সম্পাদিত *কাকতাড়ুয়া; হে*লাল উদ্দিন সবুজ সম্পাদিত *নদীপাখিমেঘ* সহ অনেকগুলো। আমাদের বন্ধু শোয়াইব জিবরানের সম্পাদনায় বের হতো *শব্দপাঠ* (বিলেতের আবু মকসুদ সম্পাদিত শব্দপাঠের সাথে ঐ শব্দপাঠের কোন মিল ছিলো না। আবু মকসুদ বিষয়টি বলেছিলেন- সেটা কাকতালিয় বিষয়।)*;* আতিক রহমান বের করতেন *স্বতন্ত্র।* যদিও তারা আমাদের সিলেটের হলেও তারা বের করতেন ঢাকা থেকে।

আমরা শুধু প্রচলিত রীতির কবিতা ও কথা সাহিত্যের প্রতি বিরোধীতা করিনি। আমরা সাহিত্যের দর্শনগত বিষয়ের প্রতিও বিরুদ্ধ অবস্থান নেই। যে সব স্থির সাহিত্যের বিষয় সাহিত্যে ক্লিশে হয়ে গেছে; কিসে যে রীতির সাহিত্যের আদৌ প্রয়োজন নেই- আমরা চেয়েছি তা বাতিল করে দিতে। এমনকি কবিতার মধ্য দিয়েও বন্ধুরা ভাবতে থাকে। এই বিরোধীতা যে, শুধু আমাকে মফস্বল শহরে ছিল তা নয়; ছিল গোটা বাংলাদেশের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে- পশ্চিমবঙ্গের অন্য অনেকের মধ্যেও। অর্থাৎ এক ধরণের এ্যান্টি স্টাবলিস্টম্যান্টের মানসিকতা আমাদের যেভাবে তৈরি হচ্ছিল। যত রকম প্রাতিষ্ঠানিকতা আছে তার বিরুদ্ধেই ছিল আমাদের মনোযোগ। *গ্রন্থী*র লেখকরা এই মানসিকতার জায়গা থেকেই তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করেছিলেন। তাদের মনোভাব এতটাই তীব্র ছিল যে, যত বড়ো পত্রিকাই হোক, আর উপযাচক হয়ে যদি পত্রিকার সম্পাদকরা লেখা ছাপাতে আগ্রহী হন; তা হলেও তারা আর এতে লিখবেন না। আসলে লিখেনওনি কেউ। এই পরিস্থিতিতে আমি ভাবলাম কবি দিলওয়ারকে নিয়ে একটা *গ্রন্থী* সংখ্যা করবো। নানা কারণে কবি দিলওয়ার আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। কিন্তু দিলওয়ারের সন্নিকটে গেলে, আমার মনে হলো, তিনি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হলেও; তিনি আকণ্ঠ প্রতিষ্ঠানে নিমজ্জিত। আর লিটল ম্যাগের প্রতি তার এক ধরনের নাক উঁচু ভাব আছে। ফলে আমি সহসা দিলওয়ার সংখ্যার কাজ স্থগিত রাখি অর্থাৎ বাতিল করে দিই। এবং সিদ্ধান্ত নিই বন্ধুদের সৃজনশীল পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক গল্প ও কবিতা এবং কিছু চিন্তাশীল গদ্য নিয়েই *গ্রন্থী* দ্বিতীয় সংখ্যা বের করার উদ্যোগ গ্রহণ করি। এবং এক পর্যায়ে সংখ্যা করি। এসংখ্যাকে কেন্দ্র করে একটা বলয় তৈরি হয়েছে- আমাদের সকলের অজান্তেই। শুধু লেখালেখি নয়, আড্ডা, চিন্তা, আগ্রহ, নতুন সাহিত্য দর্শণ এবং

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা আমাদের মধ্যে একটা প্রত্যয় জন্ম দিয়েছে- এবং এর সঙ্গে সংখ্যাটিতে রয়েছে সারাদেশের সৃষ্টিশীল তরুণ কবিবন্ধুদেরই। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেকেই আমাকে/আমাদের উৎসাহ দিতে থাকে। এবং আমরা কাজে ঝাপিয়ে পড়ি। সত্যি কথা বলতে *গ্রন্থী*'র আন্দোলনের পটভূমি বলতে তাই।

এখন, নববইয়ের এই পরিবর্তনশীল সময়ে সারা দেশেই, এবং পশ্চিমবঙ্গেও, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা একটা সুবাতাস বয়েছিল। এবং বিভিন্ন লিটলম্যাগকে কেন্দ্র করে সাহিত্য আন্দোলন। লিটলম্যাগ উচ্চকিত হয়। ... বলাবাহুল্য আমাদের সকলের গন্তব্য এই একই ছিল। ...এই পরিস্থিতিতে *গ্রন্থী* দ্বিতীয় সংখ্যা বের হয়, নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও। দ্বিতীয় সংখ্যাটি অভূতপূর্ব সাড়া দেয় সারাদেশে।

দ্বিতীয় সংখ্যার গ্রন্থী সূচী ছিলো-

প্রবন্ধ

আহমদ মিনহাজ/ বিষয় উপন্যাস

সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ/ খেলা ভাঙার খেলা

নাসিমুল হক/ কবিতা কোয়ান্টা এবং তিরিশির কণ্ঠ

অনুবাদ প্রবন্ধ

লিয়াকত শাহ ফরিদী (অনুবাদক)/ নিখিলেশ্বর জি দেবরাজু : তেলেগু সাহিত্যে বিপ্লবাত্মক কবিতা গঠন শৈলী ও বিষয়বস্তুগত দ্বন্দ্ব

কবিতা

হাফিজ রশিদ খান, মুজিব মেহদী, আশরাফ রোকন, মোস্তাক আহমাদ দীব, জফির সেতু, পাঁশু প্রাপণ।

অনুবাদ

একে শেরাম-মনিপুরী কবিতা (সম্ভবতঃ এটাই ছিলো বাংলাদেশে মনিপুরী কবিতার প্রথম লিটল ম্যাগে অনুবাদ কবিতা)

আর্ট গ্যালারী: হেলাল আহমদ চৌধুরী

অনু গল্প
শামীম শাহান

গল্প
মাহবুব লীলেন/ নির্বাণ

অনুবাদ গল্প
টি এম আহমেদ কায়সার: দি ওম্যান ইন ব্ল্যাক

স্মৃতির জানালা
আহমেদুর রশীদ/ সেই সুর বাজে অকারণ

গীত লহরী/ পি কে দেবনাথ

গ্রন্থ পরিচিতি
মোহাম্মদ বিলাল ও লায়েক আহমেদ নোমান
(মহাকবি শরচ্চন্দ্র চৌধুরী ঃ জীবন ও কার্বকর্ম- গিয়াস উদ্দিন আহমদ, তখন রুদ্ধশ্বাস জীবন- কাজী সাইদুর রহমান রাজা, রিমির ভালোবাসা- অনামিকা রেজা রোজী।

এরই মধ্যে; দশকের শেষের দিকে এসে, বন্ধুরা দিকবিদিক ছিটকে পড়ে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। সবাই অস্থিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে। ক্যারিয়ার ঘটনে/পারিবারিক চাপে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন। লিটল ম্যাগের স্বাভাবিক চরিত্র অনুযায়ী *গ্রন্থী*র প্রকাশও বন্ধ হয়ে আসে।
কিন্তু *গ্রন্থী*কে কেন্দ্র করে একটা বলয় যে তৈরি হয়েছিল; তার টের পাই আরও পরে, যখন দেশে বিদেশে *গ্রন্থী*কে মূল্যায়ন করা হতে থাকে, আমাকেও পুরস্কৃত করা হয় লিটলম্যাগের প্লাটফর্ম থেকে। চট্রগ্রাম থেকে প্রকাশিত *লিরিক* লিটল ম্যাগ - গোটা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ১৮ বছরের লিটলম্যাগ জড়ো করে পুরস্কার প্রদান করে ৬টি। তারমধ্যে *গ্রন্থী* ছিলো। সেটা ছিলো ২০০০ সালে। এছাড়াও অর্জন করে দুই বাংলার লিটলম্যাগ এওয়ার্ড। তখন একটা অনুশোচনা কাজ করে আমার ভেতরে- *গ্রন্থী* কেন স্থবির হয়ে পড়ল এই ভেবে। ... যদিও লিটল ম্যাগের ভাগ্যে এই-ই ঘটে সারা পৃথিবীতে। *গ্রন্থী* প্রকাশের প্রায় চব্বিশ বছর পর পেছনে ফিরে দেখি, সবই যেন কুয়াশা আর স্মৃতি।

প্রায় সিকি শতাব্দী পর লন্ডনে এই দূর পরবাসে পৃথিবীর এক সংকটতম মুহূর্তে আবারও আমার ভেতরে *গ্রন্থী*'র উচ্ছন্ন দিনগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে, পেছনে ফিরে দেখি আমাদের কেউ বা ইউরোপ, কেউবা আমেরিকায়, কেউ এশিয়ায়, কেউ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় আর কেউ বা দেশের মাটিতেই। এই যে বিচ্ছিন্নতা, এই যে পৃথিবীময় দুর্যোগের কালে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমরা- তা আমাকে দগ্ধ করে প্রতিনিয়ত। সেই থেকেই আমি আমাদের সৃজনশীল সময়কে- বর্তমানে ফিরিয়ে আনতে তৎপর হই।

গ্রন্থী কেন্দ্রিক লেখক আর ভাবনাকে এক করে; একটা আড্ডার আয়োজন মাথার ভেতরে ঘুরপাক খায়; আমি আবারও ডানা মেলি, এই উত্তর যৌবনের ব্যস্ত ও কর্মময় জীবনে; আসলে আমি সন্ধানে তৎপর হই আমাদের সত্যিকার বেঁচে থাকার দিনগুলোতে।

দেশ আজ গণতন্ত্রের নামে ধুকে ধুকে কাঁদছে। মৌলবাদ মাথাচারা দিয়ে উঠেছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে তার মিলিয়ে সৃজনশীল আর স্বাধীন চিন্তায় মানুষগুলো দেশ থেকে সৃজনশীল উধাও হচ্ছে।

সত্যি এক কঠিন সময় আমাদের। এই কঠিন সময়ে দাঁড়িয়ে *গ্রন্থী* শুধু আর অতীতের স্মৃতিচারণ কেনো; একটা সুদুর আগামীর প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত হতে চায়; সময় যত কঠিন হোক, আর আক্রান্ত হোক, তাই আবারও *গ্রন্থী* প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি এবছরের সূচনা লগ্নে। এবং আমি আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, সেইসব বন্ধু, যারা দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে- প্রত্যেকেই যার যার জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তারা আমার আহবানে সাড়া দেয়, কলম হাতে নিয়ে কুমারী কাগজকে তন্ত্র করে তুলে... আমার কাছে *গ্রন্থী* নতুন সংখ্যার জন্য লেখা আসতে থাকে। এবারের সংখ্যা আদিবাসী সংখ্যা। নব্বইয়ের শুরুতে বিশ্ব রাজনীতির প্রক্ষাপটে বিশ্বায়নের নামে যখন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য বিরাজ করছিল দরিদ্র দেশ আর ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীকে সেই প্রক্রিয়া আজ সমাপ্তির পথে। ... মানুষ শুধু আজ বিপন্ন নয়, বিপন্ন মানুষের ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যও। হারিয়ে যাচ্ছে ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী; এবং পৃথিবীর মাটি ঘেষে আজ তা ক্রমশ শুনতে পাচ্ছে সংবেদনশীল মানুষগুলো- *গ্রন্থী* সেটাকে ছুঁতে চায় এবং সেই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এইরূপ আয়োজন আমাদের। এবং এই আয়োজনকে, সামনে রেখে *গ্রন্থী* এক মিলনমেলার আয়োজন করতে চলেছে। ... আশা করি এই মিলনমেলা *গ্রন্থী*র লেখক, পাঠক আর শুভানুধ্যায়ীদের পদচারনায় মুখরিত হবে; *গ্রন্থী*র এই পুনরুজ্জীবন,- এক অদ্ভুদ বিস্ময়ে পৃথিবীর পথে এগিয়ে যাবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

The Gronthee institute of literature and RadhaRaman Society present

An evening of Bengali experimental Poetry & talk on

The Gronthee and Little Magazine Movement in 1990's

Guest Speaker

Poet Zafir Setu

Ass. Professor - Bangeli Litterature Depertment, SUST

Date

23

June 2018

SATURDAY

6:30pm-10:00pm

Venue

St. Margaret's House
21 Old Ford Road
Bethnal Green
London E2 9PL

Tube: Bethnal Green Underground
Bus: 8, 388, 254,106, D3, D6, 309

Contact:
Shamim Shahan
T M Ahmed Kaysher
07916 809 935

ST. MARGARET'S HOUSE

RadhaRaman Society
Unfurling Bengali Folk Culture

Organised jointly by
The Gronthee Institute of Literature
and RadhaRaman Society

পরিশিষ্ট: ২

[এই লেখাটি গ্রন্থী ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়। পুণরায় লেখাটি ছাপানোর লোভ সামলাতে পারলাম না। স্মৃতিগুলোকে মনে রাখতে হুবহু লেখাটি পুণঃমুদ্রণ করা হলো। তবে একটি কথা না বললেই নয়। এই লেখার মধ্যে তিনটি নাম উল্লেখ করছি; তাঁরা আর ইহ জগতে নেই। কবি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, 'শোকার্ত বাংলা' সম্পাদক সাখাওয়াত এবং ভি.আই. পি টেইলার্সের অগ্রজ আলাউদ্দিন। – সম্পাদক]

আড্ডা: খুলেছি স্বর্গ দ্বি–প্রহরে

শামীম শাহান

বই ঘাটাঘাটি, লেখালেখি, ধুমপান ইত্যাদি মৌতাতে মেতে মেতে শেষরাতে দু'চোখ–জাগরণ ক্লান্তিতে ঘুমে ঢুলুঢুলু করতে যাথে, রক্ত জবার মতো লাল হয়ে আসলে কিংবা যখন শুনি পেণ্ডুলামে রাত চারটা কিংবা তারো বেশী সময় সংকেত তক্ষুণি পাগলা আরশ আলী হয়ে মশারী টাঙ্গিয়ে, (কখনো সম্ভব হয় না), বিছানায় উপুড় হয়ে পড়তেই কোমল নারীর মতোই ঘুম এসে আশ্রয় নেই। পরদিন হয়তো নাস্তার ডাক শুনে কিংবা ঘড়ির দশটার সময় সংকেত শুনে যখন চোখ মেলে দিনের আলো অবলোকন করি তখন রোদ হেঁটে গেছে বারান্দা বরাবর। নিজেকে ধিক্কার দিই, যখন দেখি টেবিলে রাখা চা জুড়ে জল হয়ে আছে কিংবা ব্রেড অমলেট মৃত রমণীর হাতের মতো হিম হয়ে আছে। তবু, কি আর করা? ঝটপট গিলে ফেলা! তারপর বাথরুমে দিই ছুট। কয়েক মিনিট অতিক্রান্ত হতেই ঘরে ফিরে কাপড় চোপড় পাল্টেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া; আড্ডাবাজরা হয়তো জড়ো হয়ে আছে। দিনকার মতো আরও বোধ করি আমার দেরী হয়ে গেলো! আড্ডার নেশাটা কেনো জানি আফিমের নেশার মতো রক্ত কণিকায় মিশে আছে।

১৯৯২ সালে স্থানীয় একটি দৈনিকে চলতি দশকে ক'জন (আমি ও আমার বন্ধুরা) কবিদের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিলো। ওখানে আশির দশক সম্পর্কে একটি প্রশ্নের ইঙ্গিত করলে আমাদের অনেকেই আশির দশককে বন্ধ্যা – সিলেট সাহিত্যকেও আগাছার দশক বলায় ঐ দশকের কবি লেখকরা আমাদের উপর বেশ চড়াও তথা বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এমনকি সাহিত্য পাতায় অনেকদিন অনেকের লেখাও ছাপা হয়নি। সে দশক গোল্লায় যাক। আমরা বলছি আমাদের কথা। চলতি দশকে সিলেট সাহিত্যে বেশ ক'জন তরুণ হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো বেরিয়ে আসছেন। তাদের পদচারণায় চলতি দশকের শুরুতে থেকে আমরা একটা আত্মপ্রত্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছি। আমরা 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' পার্বত্য ঝর্ণার শক্তি অনুভব করছি। আমরা অন্ততঃ এ আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে একটি বহতা নদী এসে বাংলা সাহিত্যের সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতো অনন্ত কালের মতো। অনিষ্ট অধ্যায়নের মাধ্যমে যারা

কবিতায় বেশ পথ এগিয়ে নতুন একটা পথের সন্ধানে তৎপর তাদের মধ্যে জফির সেতু, মাহবুব লীলেন, সৌমিত্র দেব টিটো, শাহ শামীম আহমেদ, শামীম শাহান, শাহ তোফায়েল আহমেদ, কামাল তৈয়ব, আহমাদ রাশীদ, জিয়া উদ্দিন, মুস্তাফিজ শফি, সারওয়ার চৌধুরী, হেলাল আহমদ চৌধুরী, হোসনে আরা কামালী, জলি পাল, মনোয়ারা বেগম হ্যাপী এদের নাম উল্লেখযোগ্য।
প্রথাগত গল্পের বৃত্ত ভেঙ্গে গল্পকে সম্পুর্ণ নতুন আঙ্গিকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চাচ্ছেন কিংবা গল্পে নতুন ধারার প্রবর্তন করতে যে তিন লড়াকু নিরন্তর চর্চা করে যাচ্ছেন এবং আমাদের চোখের সামনে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিচ্ছেন– তারা হলেন – আহমদ মিনহাজ, জফির সেতু, মাহবুব লীলেন। তাছাড়া নিরন্তর গল্প লিখে যাচ্ছেন– শামীম শাহান, মুস্তাফিজ শফি, জিয়া উদ্দিন, সৌমিত্র দেব টিটো, সারওয়ার চৌধুরী প্রমুখ। প্রবন্ধ সাহিত্যে আহমদ মিনহাজ তার যে মৌলিক লেখা উপহার দিচ্ছেন তাতে অসন্তোষ হবার কারণ নেই। তাছাড়া মাহবুব লীলেন, জফির সেতুর নামও উল্লেখ করতে হয়। অনুবাদ কর্মেও আমরা পিছিয়ে নেই, মাহবুব লীলেন, সৌমিত্র দেব টিটো, কামাল তৈয়ব এ কর্মে কুশলী ও আশার প্রদীপ। হ্যাঁ, আমার আলোচনা মূলতঃ আড্ডার উপর। তবে প্রাসঙ্গিক কারণেই উপরের পরিচিতি। এই সময়ে সিলেটের বিভিন্ন স্থানে এদের উপস্থিতিতে জমজমাট আড্ডা গড়ে উঠে।
আড্ডার আভিধানিক অর্থ অনেকটি থাকলেও সাধারণ মানুষেরা কবি–লেখকদের হৈ হট্টোগোলকে আড্ডা অর্থে বুঝেন বেশী। লেখার উপাদান ও অনেক কিছু জানার উৎস হিসেবে আড্ডাকে হালকা অর্থে উড়িয়ে দেয়া মোটেই চলে না। কেননা এক সঙ্গে আমরা অনেকেই যখন আড্ডায় মিলিত হই তখন আমরা অনেক কিছু পরস্পরের কাছ থেকে আলোচনা–সমালোচনায় জানতে পারি। এটা লেখালেখিতে মদদ জোগায়। যতোদূর জানতে পারি আজকের শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, অসীম সাহা, মান্নান সৈয়দ, সিকদার আমিনুল হক প্রমুখ কবিরা একদিন ছিলেন বেশ আড্ডাবাজ। দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী তাঁরা নির্দিষ্ট জায়গায় আড্ডায় আফিম নেশায় মেতে থাকতেন। এই বুড়ো বা মধ্য বয়সেও তাদের আড্ডা রক্তের সাথে নেশা হয়ে মিশে আছে। আজও অনেক সংবাদ পত্রের অফিসে, মাসিক সাহিত্যপত্রের অফিসে, বন্ধুর বাড়ীতে তাদের জমজমাট আড্ডা বসে। আড্ডা কবি–সাহিত্যিকদের এক সৃজনশীল নেশা। যেহেতু আমরা তাদেরই উত্তরসূরী, সেহেতু আড্ডা ছাড়া কী আমাদের জীবন চলতে পারে! এইতো – একদিন আমরা পরস্পরের সাথে আড্ডায় মিলিত না হলে পরস্পরকে অনেকযুগ দেখিনি বলে অসন্তোষ প্রকাশ করি। আমরা এই বন্ধু–বান্ধবরা যেখানে প্রায়ই আড্ডায় বলি 'ইটের ভিতরে কাট'রা, নারকীয় পৃথিবীতে স্বর্গ–সুখ অনুভব করি; সেটা আড্ডার মাধ্যমে আর আমাদের আড্ডার নির্ধারিত স্থানগুলো হচ্ছে– অনুপম পত্রিকা অফিস, সাথী লাইব্রেরী, মালঞ্চ বুক সেন্টার, সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এবং বিভিন্ন চায়ের হোটেল। বিশেষ করে দীগন্ত রেষ্টুরেন্ট ও জালালাবাদ রেষ্টুরেন্ট। সত্যি কথা বলতে – আমাদের প্রতিদিনকার আড্ডায় শত কথা লিখলে হয়তো ফুরাবে না। তবু দু'একদিনের আড্ডার বিষয় আমি এই আলোচনায় আনার চেষ্টা করবো। হয়তো তার সিকি একভাগও আমি প্রকাশ করতে পারবো না। কিংবা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারবো না, হয়তো এটা সম্ভবও নয়।

অনুপম আড্ডাঃ

এখানকার আড্ডা প্রায় দুপুরে কিংবা বিকেলে দিকে। যেনো আমাদের বন্ধুরা 'রাজা উজির মারতে' বসেন এখানে। বলা বাহুল্য, এটা একটা পত্রিকা অফিস। সম্পাদক ও প্রকাশক মনির উদ্দিন চৌধুরী, নির্বাহী সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী'র শাসন এখানে অনেকটা শিথিল। সাহিত্য আড্ডার প্রতি তাঁদের এই উদারতা প্রদর্শন নিঃসন্দেহে সাহিত্য প্রেম ও শৈল্পিক মানসিকতার পরিচায়ক। বিশেষ করে সম্পাদক মনির উদ্দিন চৌধুরী, যিনি গতানুগতিক অনেক মালিক সম্পাদকের আমলা সুলভ আচরণের উর্ধ্বে। তার উদার দৃষ্টি ভঙ্গি নবীনদের লালনের সহায়ক। আর এই সুবাদে তরুণ লিখিয়েরা 'অনুপম'এর ছোট আয়তনকে আপন করে নিয়েছেন। হয়তো দেখা গেলো– পত্রিকার পেইস্টিং চলছে। নির্বাহী সম্পাদক মহা ব্যস্ত। কিন্তু বেচারার ব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে তাঁর পকেট থেকে চা–সিগারেটের খরচা খসিয়ে দিব্যি আড্ডায় 'তা' দিচ্ছেন লিখিয়ে তরুণরা। ছাদ ফাটানো হাসি, তর্ক আর সিগারেটের ধোঁয়ায় 'অনুপম' একেবারে নরক–গুলজার। 'ধুমপানে বিষপান' এ আপ্তবাক্যকে স্মরণ রেখেও বেচারা (নিঃ সঃ)র বলার উপায় থাকে না, 'হে তরুণরা সংযত হও'। যদিও তিনি নিজে সংযত হতে এবং সংযত থাকতে ভালোবাসেন। কিন্তু বেয়াড়া যৌবনের দাড়িপাল্লায় তার বয়সওতো অল্পই। তাই 'আসাদুজ্জামান নূর' টাইপ দাড়িতে (নূর ভাই মাপ করবেন) হাত বুলিয়ে চেহারায় উদাস করি সুলভ একটা ভাব নিয়ে এসে মুচকি মুচকি হাসিতে এটাই হয়তো বলতে চান– 'না এরারে নিয়া আর ফারা গেলো না। আমারে এরা ডুবাইলো।' তবে কি তার শ্যামলিকার কথা মনে পড়ে? মনে হয়, কারণ কোনো চ্যাঙড়া তার ভাবভঙ্গি দেখেই বুঝে নেয়, সম্পাদক ভাইজানের শহীদ হতে আর দেরী নেই। ব্যাস ঐখান থেকেই আড্ডা ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ছেড়ে শ্যামলিকার (শ্যামলিকার চিঠি: পত্র সাহিত্য অনেক আগে বাংলা সাহিত্যে প্রবাহমান অতীতে তা শুধু গল্পের বা কাহিনীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আসছিলো। এটা নিঃসন্দেহে গদ্যের উৎকর্ষ স্টাইল। সারওয়ার চৌধুরীর 'শ্যামলিকার চিঠি' শুধু একটা গল্পের নয় বরং তার মাধ্যমে আমরা সাম্প্রতিক সাহিত্য সমালোচনার আভাস পাই। অন্যদিকে বিশ্বসাহিত্যের সাম্প্রতিকতম সংবাদ আমরা একজন প্রেমাতুর তরুণ সাহিত্যিকের কাছ থেকে পাচ্ছি– যা তার প্রেমিকাকে লিখিত।) হাড়ির খবর জানতে ঔৎসুক হয়ে পড়েন। সেই কৌতুহলের ঠেলায় বেচারার অবস্থা কাহিল থেকে কাহিলতর পরিস্থিতিতে গড়ায়; পকেটের আনি–দু'আনি খসে যেতে থাকে একে একে। নির্ধারিত কাজে দেখা দেয় মনোযোগের অভাব। কণ্ঠে গাম্ভীর্য এন বলে ওঠেন– 'তোমরা পাইছো কি–তা খওছাইন। শ্যামলিকা আমার খেউ নায়। তানে তো আমি 'মনের মাধুরী' মিশাইয়া... মানে' এ অপ্রস্তুত, কিংকর্তব্য বিমূঢ় পরিস্থিতি তকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই কি–না জানি না, তিনি এখন শ্যামলিকার উপদেষ্টা এবং প্রেমিকের আসন থেকে দাদু ভাইয়ের আসনে নেমে এসেছেন... বেচারা। তাই বলে কেউ যেন না ভাবেন, তরুণ এই লিখিয়েরা কেবল শ্যামলিকাকে নিয়েই মেতে থাকেন। শ্যামলিকা পর্ব আড্ডার প্রাণ হলেও তাকে তৎক্ষণাত বিস্মৃত হয়ে কিংবা বিষয়টার মাঝখানে অভদ্র চড় কষিয়ে হয়তো 'বেলীবনে বেহুশ জফির সেতু' বলে বসে, 'ভাই কাল সারারাত আমি শুধু খেয়েছি মহুয়ার মদ!' কেউ এর কারণ জানতে চাইলে জফির সেতু প্রথম প্রথম দ্বিধায় ভোগেন, বলবো কি বলবো না। এরকম কিছুক্ষণ চলার পর পেটের ব্লাডার

যখন ফুলে ঢোল হয়ে আসে, অন্যান্য তরুণ এমন কি নিঃ সঃ ও যখন পত্রিকায় চোখ বুলানো কিংবা কাগজে কলম কষতে থাকে তখন' বোমফাটে কবি গল্পকার জফির সেতু সিনেমার নায়কের মতো ডায়লগ ছাড়েন 'অর্ধস্ফুট ফুলের মত তার কুমারী স্তন, সোনার ইলিশ যুগল পা! জানিস তোরা, কাল অনেকটা প্রেমের কবিতা লিখলাম। শুধু ... কে নিয়ে। ভায়েরা আমাকে রক্ষা কর। একরাত্রে এতগুলো কবিতা লেখার ঠেলায় বিমর্ষ আবার ভেতরে ভেতরে তৃপ্ত কবিকে নাকচ করে দিয়ে মাহবুব লীলেন কিংবা শাহ শামীম আহমেদ কিংবা শামীম শাহান বলে বসেন– 'আরে দুর মিয়া, এটা খবর হলো নাকি। একজন বেলী থাকলে আমরাও এমন কতো কবিতা লিখতে পারি।' হু–হু, শুরু হয় হাসি। বিষন্ন বাজপড়া কবিকে সান্তনা দিতে কেউ–ই এগিয়ে আসেন না। তবে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেন কবি সম্পাদক আহমাদ রাশীদ 'চোখের সামন দিয়ে হেটে যাওয়া যুবতী দেখে জফির সেতুর উদ্দেশ্যে বলে বসেন– জফির সেতু কেমন লাগলো!' এখানে কথা হলো যে জফির সেতুর পছন্দ হয় না এ সংসারে এমন মেয়ে একটাও নেই! 'বেচারার কবি'র চোখ বটে।' জমে উঠে প্রেমালাপ। প্রেমের সাগরের ডুব সাতারু মাহবুব লীলেন কাউকে তাঁর গোপন কথা শুনাবেন না। সুদর্শন শাহ শামীম আহমেদ বলবেন– 'এ জনমে প্রেম হলো নারে দোস্ত!' আহমদ মিনহাজ বলবে– 'আমার এই খাটো আয়তন দখল করতে যাবে কে!' আড্ডায় সবার প্রিয় ঈশ্বর হেলাল আহমদ চৌধুরীকে নিয়ে জমে উঠে রসিকতা। বেচারা ছবি আঁকতে বসলেই একটা সমস্যা তাঁর মাথায় ভর করে। সমস্যাটা অবশ্য ব্যক্তিগত এবং হয়তো কিছুটা হৃদয় ঘটিত। জনৈকা বনলতা সেন' তাঁর চোখ নিয়ে শিল্পীর তুলিতে কিংবা কলমে ভূত হয়ে আছর করেন। তাকে তাড়াতে না পেরে প্রাণান্ত এই শিল্পী একের পর এক বন্দী নারীর স্ক্যাচ একে চলেছেন। বোঝার উপায় নেই, তিনি কাকে বন্দী করতে চান– নারীকে না নিজেকেই। তবে হেলাল আহমদ চৌধুরী ইতিমধ্যেই সম্ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর আঁকাজোকায়। আর শামীম শাহানের দীর্ঘশ্বাসী ও 'স্মৃতির চিঠি: শিউলীকে (প্রয়াত প্রেমিকা) তো মেঘ হয়ে ভাসছে বাংলার আকাশে আকাশে! প্রেম দর্শনে ফ্রয়েডকে সমর্থন করেন মাহবুব লীলেন, জফির সেতু। সেদিক থেকে জফির সেতুর সুক্ষ্ম মতবাদ তার 'গল্পের বিরুদ্ধে গল্পে'র কাহিনী! আলোচনায় মোড় ঘুরে চক্রাকারে। লেখালেখির প্রসঙ্গ উঠতেই শাহ শামীম আহমেদ বলে বসেন 'আমাদের তুলনায় ঢাকার তরুণরা মোটেই এগিয়ে নয়, তবু পত্রিকাওয়ালা আমাদের বিমাতা সুলভ আচরণ করে।' শামীম শাহান বলে বসেন, 'ওরা মনে করে তারা আর্য আর আমরা অনার্য!'

শুরু হয় কবিতার ছন্দ, মাত্রা, শব্দ, উপমা, বাংলা সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে কাকের মতো চিৎকার; আর চলতে থাকে সমালোচনা আর নিজেকে জাহির করার তোড়। শুধুই তাই নয়– এরপর মোড় ঘুরে আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে। যারা শ্রোতা থাকেন তারাও এ বিষয়ে পক্ষে কিংবা বিপক্ষেও যুক্তি উপস্থাপন করেন। গুরু গম্ভীর প্রাবন্ধিক আহমদ মিনহাজও যোগ দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বেচারা এমনিতেই আয়তনে খাটো যদিও সুন্দর চেহারার অধিকারী, তারপরও কবিতা...। মগজে ঢুকে না। ফলে তার অবস্থা হয় বামন হয়ে চাঁদে হাত ধরার মতো। তবে কবিতা যে একেবারে বুঝেননি তা নয়, কবিদের সাহিত্য কর্মের উপর আলোচনাধর্মী লেখা উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন ইতিমধ্যে। আলোচনা কবিতা ছেড়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাম্প্রতিক কোনো বিষয়ে

(সেটা হতে পারে গোলাম আযমের 'ফাঁসি', হুমায়ূন আযাদের 'নারী', তসলিমা নাসরীনের 'শাড়ী')। এ প্রসঙ্গে মৌলভীবাজারের সৌমিত্র দেব টিটোর কথাও বলতে হয়। তসলিমা যাঁর স্বপ্নের নারী। ঘাসের ভেতরে ঘাস কত বড় হয় তা জানতে বড় উৎসুক এই কবি গল্পকার। তাঁর হঠাৎ উপস্থিতি, দীর্ঘ দেহ ঝাঁপিয়ে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্দাম তর্কের মাঝখানে 'ফাহমিদা' প্রসঙ্গ আনন্দের খোরাক যোগায়। এ ছাড়াও মার্কিন প্রবাসী ফকির ইলিয়াছ দেশে আসার পর প্রায় তাঁর বিবাহ তৃপ্ত চেহারা দেখান 'অনুপমে'। যদিও তিনি বর্তমানে প্রবাসে চলে গেছেন। তার আলোচনার বিষয় বস্তুত: বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনীতি হলেও সাহিত্যের খবর জানতে তিনি যে আগ্রহী তা তাঁর কথাবার্তায় পরিস্কার বোমা যায়। মার্কিন দুনিয়ার খবরও অনেকে তাঁর বুলি থেকে সংগ্রহ করেন। বর্তমানে সবকটি লিটল ম্যাগাজিন এবং বিভিন্ন পত্র–পত্রিকায় তাঁর উপস্থিতি প্রায় নিয়মিত। বয়সে তরুণদের অগ্রজ হলেও খোলামেলা, খোশমেজাজের এই কবি, কলামিস্ট, গীতিকার সবার বেশ পছন্দ।

সেদিন অনুপমে হয়ে গেলো বছরের সেরা আড্ডা। আহমাদ রাশীদের 'শুদ্ধস্বর' প্রকাশনা ছিলো ঘরোয়া পরিবেশে। 'অনুপমে'র গোটা অফিস জুড়ে কানায় কানায় কবিরা অবস্থান করেছেন 'হ্যামিলিন শহরের ইঁদুরদের মতো'। অগ্রজদের মধ্যে ঐদিন উপস্থিত ছিলেন আশির দশকের শক্তিমান কবি, প্রাবন্ধিক কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, কবি ফকির ইলিয়াছ, যুগভেরীর মো. আনিছুল হক ও লিয়াকত শাহ ফরিদী এবং বাদ বাকীরা আমরা জন বিশেক। এইদিন অনুপমের ছাদ ফাটা অবস্থা ছিলো। গীতিগল্প নিয়ে আলোচনা–সমালোচনায় বোম–ফাটা অবস্থা। কেউ গীতি গল্পের তিন নায়ক জফির সেতু, মাহবুব লীলেন, আহমদ মিনহাজকে সমর্থন করছেন অন্যেরা বিপক্ষে। পান খেতে খেতে কবি লিয়াকত শাহ ফরিদী বললেন– 'আপনারা তর্ক করুন, আমি কিছু বলতে পারছি না। কেননা, এ ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই।' কবি ফকির ইলিয়াছের সাথে মাহবুব লীলেনের হয়ে গেলো এক তরফা...। মধ্য পথে মাহবুব লীলেনের গল্প 'নখর' এর প্রশ্নে জফির সেতু'র সাথে মতানৈক্য ঘটে। জফির সেতু'র যুক্তিকে সমর্থন করেন সহযোদ্ধা আহমদ মিনহাজ। সবশেষে কবি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার তার রক্ত–রাঙা চোখ তুলে বলে বসলেন– 'গীতি নাট্য কিংবা কাব্য নাট্যের ক্ষেত্রে আমরা এখনো সফল হতে পারিনি। আর আপনারা গীতিগল্পে কতটা করবেন, আমি বুঝতে পারছি না! তবু চালিয়ে যান।'

তাছাড়া অনুপমের আড্ডায় মাঝে মধ্যে দেখা যায়– শাহ তোফায়েল আহমেদ, 'চোখ' সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, 'প্রান্তর' সম্পাদক মো. জিয়া উদ্দিন, 'সাঙ্গ' সম্পাদক লায়েক আহমেদ নোমান, 'মনোজ' সম্পাদক ফয়জুর রহমান ফয়েজ, সাইদুর রহমান সাঈদ, 'ফিনিক' সম্পাদক হেলাল আহমদ চৌধুরী, 'জীবন' সম্পাদক মতিউল ইসলাম মতিন, 'শোকার্ত বাংলা' সম্পাদক সাখাওয়াত প্রমুখ। এছাড়াও প্রায়ই নিয়মিত আসেন– ভি.আই.পি টেইলার্সের অগ্রজ আলাউদ্দিন। দিনদিন বেশ সরগরম হয়ে ওঠে এই আড্ডা। অনুপমের আড্ডা যে আড্ডা নয় – নরকে নাইট্যাঙ্গেলের গান।

মালঞ্চ ও সাথী লাইব্রেরীঃ

তরুণদের নতুন করে আড্ডার সূচনা হয়েছে এই দুই বইয়ের দোকানে। জায়গা দু'টি আড্ডার স্থান হিসেবে বেশ চমৎকার। মালঞ্চের পরিচালক মোঃ মাসুক মিয়া ও সাথী লাইব্রেরীর স্বত্ত্বাধিকারী এম এ খালীক সাহিত্যের ব্যাপারে বেশ উৎসাহী। এখানকার আড্ডা বিশেষ করে বিকেলেই গড়ে উঠে। আমাদের গ্রুপের সবাই–ই এই আড্ডায় আসেন। তবে মুস্তাফিজ শফি এ আড্ডার নিয়মিত সদস্য। বিকেলে অফিস ফেরত তাঁর রমণী মোহন চেহারা নিয়ে ধীর পদে আড্ডায় ঢুকে দেন এক দুর্লভ হাসি। শামীম শাহান তাকে দেখলেই একটি কথাই বলেন– বেশ চমৎকার। যদি নারী হতেন...। শুরু হয়ে যায় নিত্যদিনকার আড্ডা। পুরনোরা ছাড়াও এ আড্ডায় নতুনদের মধ্যে অংশ গ্রহণ করেন– কাওসার ইমান, হেলাল উদ্দিন সবুজ, হালিম আহমদ শাওন, আব্দুল জলিল, ফরিদ আহমদ, আমিনুর রশিদ তুহিন প্রমুখ। লেখালেখির বাইরেও যারা আড্ডায় সঙ্গ দেন– মাহবুব আহমদ, তৌফিকুল আলম বাবলু, শামীম, সারওয়ার, আরিফ চৌধুরী, শামসুল ইসলাম বাবলু প্রমুখ। সাথীর আড্ডায় সংগীত নিয়েও বেশ আলোচনা চলে। কেননা এম.এ খালীক সংগীত প্রিয় লোক। তিনি তার পার্টির জন্য জফির সেতু ও শামীম শাহানকে দিয়ে গান লেখান সুর দেয়ার জন্য। তবে সুরকার ও শিল্পী বাবলু লেখার সাথে সাথেই আড্ডাবাজদেরকে বাদ্যবিহীন গান নমস্বরে উপহার দিতে সক্ষম হন। তাছাড়া চলে পুরনো ও নিত্য নতুন সংলাপ। আড্ডার আড্ডা কখন বেজে যায় রাত ন'টা। কেউই টের পায়না!

এম. সি কলেজের বাংলা বিভাগের আড্ডাঃ

এমসি কলেজে আড্ডা জমে সাধারণত: কলেজ খোলা দিনে–দুপুরে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে। এখানে আড্ডা জমার কারণ – আমরা অনেকেই এই ঐতিহ্যবাহী কলেজের ছাত্র। তাছাড়াও আমাদের বন্ধুরা মেয়েদের সাক্ষাৎ নিতে দুপুরের দিকে কলেজে উপস্থিত হন। বাংলা বিভাগের সামনে আড্ডা জমার কারণ– এখানে সুন্দর পরিবেশ, এছাড়াও জফির সেতু, হেলাল আহমদ চৌধুরী, হোসনে আরা কামালী, আবিদ রহমান লিটন এই বিভাগের ছাত্র। তারা বেশ বন্ধু বৎসল। এ আড্ডায় ফিলসফি থেকে আসে রসিক পুলক রঞ্জন, (যিনি পুলকদা নামে খ্যাত), শান্ত মুহিত..., হেলাল উদ্দিন সবুজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে ফরিদ আহমদ, আমিনুর রশীদ তুহিন, গণিত থেকে শামীম শাহান এবং অন্যান্য অনার্স বিষয় থেকে আসেন সাহিত্যানুরাগীরা।

এছাড়া মধ্যে মধ্যে এরকম আড্ডায় জড়ো হন– জলি পাল, নাজমা বেগম, মুক্তি, অজিত, মুমিন চৌধুরী, বিলাল মোহাম্মদ প্রমুখ। যেখানে আড্ডা জমে উঠলে চলে আসি কলেজ ফটকের পাশের গাছের নীচের সবুজ ঘাসে। বাদাম, সিগারেট খেতে খেতে আর নিতম্বিনী নারীদের চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত এক্সরে রিপোর্ট বের করে তবে আড্ডার সমাপ্তি। তবে এমসি কলেজের আড্ডায় গেলে অনেক জিনিস আমাদের চোখে পড়ে– মাহবুব লীলেনকে ফাল্গুনী আকাশে নিরুদ্দেশ যাত্রা, রতনদা'র রত্না খোঁজা, আবুল হারিছের নীলিমা অন্বেষণ, ফরিদ আহমদের লোনা জলে ডুব সাঁতার, লায়েক আহমেদ নোমানের বিতলামী, জফির সেতুর শখের জ্বলন, শামীম শাহানের নিরুদ্দেশ তাকানো ইত্যাদি ইত্যাদি।

বইপত্র আড্ডা

বস্তুত অনুপম আড্ডার পরই যে মৌলিক আড্ডার কথা আসে তা হচ্ছে 'বইপত্র' লাইব্রেরী আড্ডা। এ আড্ডায় যারা অংশ নেন তারা হচ্ছে ক্ষুদে বুদ্ধিজীবি। যাঁদের পেশাও চলুক, আড্ডা চলুক এরকম আড্ডায় অংশ নেন কবি গল্পকার নূরুজ্জামান মনি, কবি আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, কবি শুভেন্দু ইমাম, কবি তুষার কর, গোলাম হোসেন আজাদ, তনুজ কান্তি দে, রানা কুমার সিংহ, তুষার নাগ, আব্দুল হাকিম প্রমুখ। এদের মধ্যে অনেকেই লেখালেখি করেন। তবে অনুপাতে যা নগন্য। এ আড্ডায় নবীনদের 'প্রবেশ–নিষেধ' এরকম একটা মনস্তাত্তিক সাইনবোর্ড রাখা। যেটাকে এ আড্ডার নায়করা ধরে রেখেছেন। এখানে আলোচনার বিষয় মূলত: সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি ইত্যাদি লক্ষণীয়। এছাড়াও আছে এই প্রজন্ম তথা পূর্বে যারা লেখালেখিতে ছিলেন তাদের নিয়ে মাঝে মধ্যে আলোচনা হয়। যারা মাঝে মধ্যে এখানে ডু মারেন তাদের মধ্যে একে শেয়াম, মোস্তফা কামাল আহমদ, মাহবুব লীলেন, শাহ শামীম আহমেদ, জফির সেতু, শাহ তোফায়েল আহমেদ, শামীম শাহান প্রমুখ। এ আড্ডা আপন গতিতে গতানুগতিকভাবেই থাকে।

মরা আড্ডাঃ

ইতিমধ্যে মরা আড্ডা হিসেবে যে সব আড্ডা স্বীকৃতি পেয়েছে – 'বাংলার আলো', 'সাপ্তাহিক পত্রিকা', 'সিলেট বাণী', 'দৈনিক পত্রিকা', সেলিম ট্রেড এণ্ড কমার্স প্রমুখ অফিস।

এতক্ষণ যা বললাম তা আড্ডায় খন্ডাংশ মাত্র। মাঝে মাঝে আমার আশংকা হয়, যে আড্ডাগুলো এখনো সজীব আছে হয়তো এক সময় মৃত্যু তাদের গ্রাস করবে। অপমৃত্যু থেকে রক্ষার একটা উপায় বোধ হয় সিলেটের প্রধান সংবাদপত্রগুলো রাখতে পারে। সাহিত্যের পাতা প্রকাশে তাদের যে অমনোযোগ এবং অবহেলা লক্ষ্য করা যায় তা তরুণ প্রজন্মকে এই পত্রিকাগুলোতে লিখতে কিংবা ঐখানে ভীড় জমাতে নিরোৎসাহীত করে। নিঃসন্দেহে সাহিত্যের সু–রুচি এবং সুস্ততার ক্ষেত্রে তাদের উদাসীনা ক্ষতিকর। অথচ অতীতেও দেখেছি সংবাদপত্র অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিকের এবং সাহিত্যানুরাগীদের লালনে সহায়তা দান করেছে। কিন্তু বর্তমানে সাহিত্য সম্পর্কে তাদের নাক উঁচু মনোভাবের কারণ একমাত্র ... জানেন। তরুণদের আজ চারদিকে দুঃসময়। তাদের স্বাপ্নিক মনটাকে সাহিত্যের সুস্থ ভূমিতে নিয়ে আমার একটি পথ – তাদের সৃজনশীলতার বিকাশের পথটাকে উন্মুক্ত রাখা। আমি বলি না এ দায়িত্ব কেবল সংবাদ পত্রওয়ালাদেরই; যারা সাহিত্যকে ভালোবাসেন তারা প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা রাখতে পারেন। তারপরও যদি কেউ না রাখেন; তরুণদেরকে রাখতে চান তালাবদ্ধ একটি ঘরে; তখন তরুণদের কি ভূমিকা হতে পারে? আমার মনে হয় পথ একটাই–

'যদি তোর ডাক শোনে কেউ না আসে
তবে একলা চলোরে।'

সিলেট: ১২/০৬/৯৩

পরিশিষ্ট: ৩ (১ম সংখ্যার প্রচ্ছদ :: অক্টোবর ১৯৯৩)

পরিশিষ্ট: ৩ (২য় সংখ্যার প্রচ্ছদ:: মার্চ ১৯৯৫)

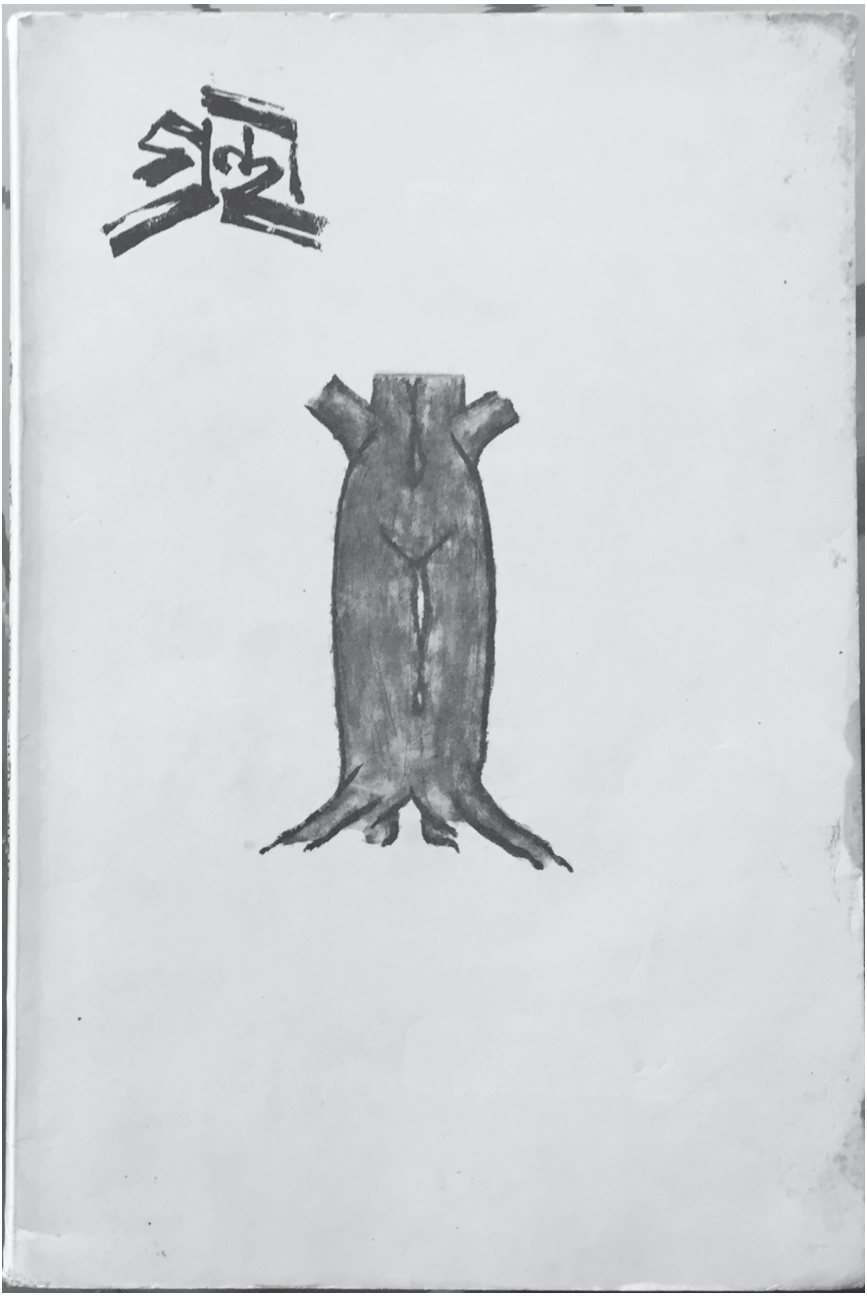

পরিশিষ্ট: ৪ (১ম সংখ্যার লেখক সূচী:: অক্টোবর ১৯৯৩)

সূচী

প্রবন্ধ
- আহমদ মিনহাজ/ক্রান্তি পথের যাত্রী
- নাসিমুল হক/বিজ্ঞানঃ কোয়ান্টাম–ছন্দের ধ্রুপদী সংগীত

গুচ্ছ কবিতা
- কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার
  - ☐ মানুষের পতনের পরও /অস্তিত্বে নয়/ তোমার চেয়েও মহা/সুধীন্দ্রনাথের প্রতি
- ফকির ইলিয়াছ
  - ☐ শঙ্খের কুসুম/ দূরের দাঁড়ানো বাতাসে/সূচনার আদিত্যে দাঁড়িয়ে/অনাগত

ত্রয়ী কবিতা
- শাহ্ শামীম আহমেদ
  - ☐ শিল্পের অনল/নিজস্ব নিয়মে আছি স্বরচিত সন্ন্যাসে/আভূমি বিধ্বস্ত এই দণ্ডিত জনপদে
- শাহ্ তোফায়েল আহমেদ
  - ☐ এই নিশ্বাসের উৎসবে/অনড় দাঁড়িয়ে আছি, দু'হাতে স্বপ্ন–বিষ/অনের শেষ ধাপ

যুগল কবিতা
- মুস্তাফিজ শফি
  - ☐ রিলিফের শাড়ী/প্রহরী
- ফারহানা ইলিয়াছ তুলি
  - ☐ রৌদ্র ঝরা গান/শ্রাবণের বৈভবে

অনুবাদ
- সৌমিত্র দেব টিটো–সনেট/ভালোবাসতে দাও

গল্প
- জফির সেতু/নিহত মেগোলিন
- মাহবুব লীলেন/আর্মাডিলো

চিত্রকলা
- হাসান জহির/ শিল্পীর মোহ শিল্পীর অঙ্গীকার

সমালোচনা
- শামীমা চৌধুরী/প্রজন্মের সেতুবন্ধন

পাঠ প্রতিক্রিয়া
- তানহা রাহমান/কয়েকটি লিটল ম্যাগ

জার্ণাল
- শামীম শাহান/আড্ডা

গ্রন্থী সূচী

প্রবন্ধ আহমদ মিনহাজ বিষয় উপন্যাস
সুব্রত অগাষ্টিন গোমেজ খেলা ভাঙার খেলা
নাসিমুল হক কবিতা কোয়ান্টা এবং তিরিশের কণ্ঠ

অনুবাদ প্রবন্ধ লিয়াকত শাহ ফরিদী

কবিতা হাফিজ রশিদ খান মুজিব মেহদী আশরাফ রোকন
মোস্তাক আহমাদ দীন জফির সেতু পাঁশু প্রাপণ

অনুবাদ এ কে শেরাম মনিপুরী কবিতা

আর্ট গ্যালারী হেলাল আহমদ চৌধুরী

অনু গল্প শামীম শাহান

গল্প মাহবুব লীলেন নির্বাণ

অনুবাদ গল্প টি এম আহমেদ কায়সার দি ওম্যান ইন ব্ল্যাক

স্মৃতির জানালা আহমেদুর রশীদ সেই সুর বাজে অকারণ

গীত লহরী পি কে দেবনাথ

গ্রন্থ পরিচিতি মোহাম্মদ বিলাল লায়েক আহমেদ নোমান

পরিশিষ্ট: ৫ (১ম সংখ্যার সম্পাদকীয়)

নেপথ্য সংলাপ.....

কণ্ঠ অব্দি পানিতে ডুবানো তবু টেন্টালাস ছাতিফাটা প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কাৎরায়
জা...ল! জা....ল! বলে।
আজকের দিনে আমরাইতো সেই টেন্টালাস!
চোখের সামনে ঝুলছে ঝলমল স্বর্গ তবু আমরা পুড়ছি
আমাদের অপরাধ....;
আমাদের জন্ম তৃতীয় বিশ্বে
আমাদের জন্ম এটোমিক ডাইনোসোর হিংস্রতার নীচে,
আমাদের জন্ম দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম একটি দেশে;
যে দেশ জন্মের দুই যুগ পুর্তির আগেই হয়তো
এগিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধের দিকে
যে দেশে স্বাধীনতা—সৈনিকরা জীবিত অথচ বিপন্ন স্বাধীনতা
আমাদের অপরাধ;
রাজনৈতিক খুন, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের আতুড়ঘর
দক্ষিণ এশিয়ায় জন্ম আমাদের
আমাদের জন্ম এই জঘন্য উপমহাদেশে যার এক একটি খণ্ডের
পরিচয় একেকটি ঘৃণিত সম্প্রদায়ের নামে, কোন জাতির নামে নয়

তবুও আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছি মানুষ নামের পরিচয় পত্র হাতে;
আজকের ইডিপাস!
অমোঘ নিয়তি কতো নির্মম হতে পারে আমরাও দেখে নিতে চাই—
হার না মানা তারুণ্যের অহংকারে!
আর তাই 'গ্রন্থী' ফোটা ফোটা রক্ত মাংসের নির্যাস

এই দারুণ দুঃসময়ে যারা কলম হাতে রাখার প্রতিজ্ঞায়
নিয়েছে স্বেচ্ছা নরক—নির্বাসন
এদের সাথে ওই দূরের গ্রন্থী পাঠক, তাদের
গ্রন্থি—বন্ধনের জন্যই জন্ম 'গ্রন্থী'র

এই 'গ্রন্থী'র সকল গ্রন্থীকে শুভেচ্ছা আমাদের!
তার সাথে লেখক—শ্রমিক—সুহৃদ যারা বাড়িয়েছেন হাত; এবং
আমাদেরও হাত বাড়ানো রইলো 'গ্রন্থী'র সংযোগ সবার সাথে গ্রন্থির।

পরিশিষ্ট: ৫ (২য় সংখ্যার সম্পাদকীয়)

কিছুটা ভালবাসা চেয়েছিল সে
কিছুটা বৈরীতা ॥

সময়টা অস্থির। পরিবেশটা বৈরী। আমাদের মেধা, মনন, তারুণ্য খাবলে খাচ্ছে দুঃসহ এক স্থবিরতা। কিছুই আমাদের অনুকূলে নেই। অনুকূলে ছিলও না কখনো। স্থবির সময়ে মুক্তি ও শুশ্রূষার আলো খুঁজে ফেরা সময়হননের নামান্তর যদিও.... তবু, হ্যাঁ, তবুও 'আলো, আরো আলো চাই' বলে যারা এখনো চিৎকার করে ওঠে, তারাই আমাদের পথ, পথ্য এবং পাথেয়।

আলো-পিপাসু একঝাঁক তরুণ। ক্ষমাহীন স্তব্ধতায় হাতড়ে ফেরে আলোর মশাল। তাদের পেছনে লাফিয়ে ওঠে ভয়-শঙ্কার কালো থাবা। ভয়কে উপেক্ষা করে তারা বের করে লিটলম্যাগ। বেরোয় গ্রন্থী। বেরোয়, যেহেতু বাংলার মেঘে-রোদে সিক্ত তরুণেরা এখনো স্বাপ্নিক। এখনো তারা ডুবে যায়নি স্বপ্নহীনতায়।

স্বপ্নচারীরা আড্ডা জমায়। ধূসর শহরের মলিনতায় ক্ষয় করে খানিকটা উত্তাপ। দু'আঙুলের ফাঁকে পুড়ে নিকোটিন। উড়ে ধোয়া। স্বপ্নচারীরা একাগ্র হয়। তাদের একাগ্রতার কাছে সোডিয়াম বাতিও বুঝি নুয়ে আসে। তারা, তাদের ছায়ারা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। ফিনকি দিয়ে বেরুনো সূর্যের টকটকে লালিমাকে ছোঁবে বলে আকাশে বাড়ায় হাত। সেই হাতে ছিনিয়ে আনে মুঠো মুঠো রোদ্দুর। উষ্ণতা। আগুন। শিল্পতো এই।

শরাহত পাখির যন্ত্রণায় কবি বক্ষে যে ধ্বনি ও কল্পনারা জন্ম নিয়েছিল একদিন, সে আলম্বনে গ্রন্থীর বেড়ে ওঠা। নীরবে একটি বছর পার করে আজ যে দ্বিতীয় জন্মের মুখ দেখলো।

জন্মমুহূর্তে মানুষের কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ কোনো উদ্দেশ্য রাখে না। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে সে রচনা করে উদ্দেশ্য। জীবনের গভীর কোনো অর্থ। জাগতিক অর্থ-বিত্ত, কীর্তি-প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছলতার অর্থময়তায় নিহিত অর্থহীনতাকে ক'জন বোঝে? যারা বোঝে, বুঝতে চায়, তারা অপাঙ্‌ক্তেয়। আমাদের স্থূল অর্থময়তার মধ্যে গ্রন্থীর অর্থহীন আত্মপ্রকাশ এ-কারণে যে--সেও অপাঙ্‌ক্তেয়র দলের।

তাই, প্রথাগত সম্পাদকীয় নয়। নয় 'ইহা একটি লিটলম্যাগ' এর বিজ্ঞাপিত চিৎকার। কেননা, আজ, আমরা, স্বাধীনতার সমানবয়সী যুবকেরা, নিজেদের পুঁজি ক্ষইয়ে মুখোমুখি কিছু প্রশ্নের, অমোঘ জিজ্ঞাসার।

জিজ্ঞাসার শিরোনাম হোক্--কাকে বলি লিটলম্যাগ এবং কারাইবা লিটলম্যাড?

জিজ্ঞাসাটির অনুসন্ধান জটিল। লিটলম্যাগ আর লিটলম্যাড-এ সয়লাব বাংলাদেশে কারা প্রকৃতই লিটলম্যাগ ভালবেসে 'ম্যাড' আর কারা পাগলামীর মুখোশ এঁটে খোঁজে তেজারতীর চোরাগলি ..... তা নির্ণয় দুরূহই বটে! অনেক স্বপ্নচারী নিমগ্ন খ্যাতির মোহে। মগজে বাজারী-হাওয়ার ঘুরপাক। দৈনিকের বর্ণহীন সাময়িকী, প্রতিষ্ঠানের 'রিভলবিং চেয়ার' এ বসে থাকা 'পাউডার্ড শিম্পাঞ্জী'দের 'রগড়'এ আক্রান্ত এইসব মুখদের আমরা চিনিনা। এরা আমাদের আত্মীয়, বন্ধু, সুহৃদ, সুজন কেউ নয়। বিপক্ষে যারা লালন করে স্বপ্ন, যারা বিকোয়নি কিংবা এ-পর্যন্ত বিকিয়ে দেয়নি নিজেদের যাবতীয় সম্ভাবনা ও অসহায়ত্বকে তারাই আমাদের কাঙ্খিত লিটলম্যাগ/লিটলম্যাড। এই সব পাগলদের প্রতি গ্রন্থী রাখে তার আস্থা ও ভালবাসা।

নান্দনিক শুভেচ্ছা নয়। গ্রন্থীর প্রতিটি মুদ্রিত অক্ষর, প্রত্যেকটি মুদ্রিত শব্দ অভিবাদন জানায়-লিটল ম্যাগের আপোষহীন যোদ্ধাদের। জানি, পথ দুর্গম। গ্রন্থিল। আঁকাবাঁকা। পদে

পদে পিছলানোর ভয়। ধৈর্য ও সংযমকে ক্লেদাক্ত করার হাতের সংখ্যাও কম নেই জানি। আবার এও জানি, পথ যতো বন্ধুরই হোক-- সাহসীরা কখনো হেলে না। তোমরাও হেলবে না; এ কামনা গ্রন্থীর শুরুতেই।

পুরনো একটা গল্প আছে। গ্রামের সহায়সম্বলহীনা এক অভাগী হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে পড়লো। গ্রামবাসীরা গর্ভবতী হবার কারণটি অনেক চেষ্টা করেও জানতে না পেরে একে দুর্ঘটনা হিসেবেই মেনে নিলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই দেখা গেলো মহিলাটি পুনরায় গর্ভবতী। এবারও তার অসহায়ত্ব বিবেচনা করে গ্রামের মুরব্বীরা তাকে ছেড়ে দিলেন। পরের বারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এবার সবাই তাকে চেপে ধরেছে, বলতেই হবে মূল ব্যাপারটি। দরিদ্র যুবতীর কোনো অবলম্বনই ছিল না। সারা গ্রাম সে ছেঁড়া মাদুর বগলে ঘুরে বেড়াতো। যেখানে সুযোগ পেত মাদুর বিছিয়ে শুতো। লজ্জা ভেঙে সে বললো- কি করুম, আমি কাউরে না করতে পারি না। গ্রন্থী জানেনা বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে এরূপ 'ছেঁড়া মাদুর'দের সংখ্যা কতো। তবে, যারা, গল্পের রমণীটির মতো না করতে জানেন না, তাদের প্রতি সাবধানবাণী একটাই 'বারবার গর্ভবতী হবার পরিণতি কিন্তু সুখকর নয়।' পক্ষান্তরে যারা লেখা প্রকাশের অনিশ্চয়তাকে মেনে ধৈর্য ধরতে শিখছেন তাদেরকে একটি কথাই বলার আছে 'ধৈর্য ধরো বন্ধুরা, ধৈর্যের ফল মিষ্টি'।

গ্রন্থী এ-সংখ্যায় যারা লিখলেন, তারা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা বিষয়ে তাদের নিজ নিজ যুক্তি ও ধারণার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই অঙ্গীকারে হাত মিলিয়েছেন: তথাকথিত লিটলম্যাগ, দৈনিক-সাপ্তাহিকের বাজারী মানহীনতায় তারা নিজেকে বিকোবেন না। সে জন্যে গ্রন্থী তাদের লেখা ছাপিয়ে দিলো।

গ্রন্থীর লিখিয়েরা সবাই প্রায় আনকোরা। লেখালেখির বয়স কারোই বেশিদিনের নয়। তাদের লেখার ত্রুটি, বিচ্যুতি, ভ্রান্তি এবং প্রকাশভঙ্গির সীমাবদ্ধতাকে তারা অস্বীকার করেন না। কিন্তু আন্তরিকতার স্ফুলিঙ্গ ঠিকই ঠিকরে পড়েছে তাদের কলমে। এদের অনেকেরই প্রতিষ্ঠান বিষয়ে রয়েছে স্পষ্ট ধারণার অভাব। আছে দ্বিধা, সংশয় ও স্ববিরোধীতা। কেন প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা--এই বক্তব্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে এদের সময় লাগবে আরো। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই একমত:

১. বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান দারিদ্র ও সর্বগ্রাসী শূন্যতার পেছনে ক্রিয়াশীল সাহিত্যকে একচেটিয়া বাজারের অভিমুখী করে তোলার প্রবণতা।

২. শীর্ষ দৈনিক, ছাপ্পামারা ঢাউস ঢাউস লিটলম্যাগের বড় অংশই একঘেয়ে চর্চায় সৎ সাহিত্য উৎপাদনে নপুংসকের মতো অক্ষম।

৩. লেখকদের পারস্পরিক সহমর্মিতার পরিবর্তে গ্রুপিং, দলাদলি, কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির রাজনীতির ফলে অবহেলিত তারুণ্যের সৃজনীশক্তি।

অর্থাৎ, তারা এখানেই একমত যে দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নবীন কলম-সৈনিকের স্বপ্ন, মেধা, সম্ভাবনা জিম্মি কতিপয়.... হাতে। এ উপলব্ধি তাদেরকে গ্রন্থীর এবং গ্রন্থীকে তাদের নিকটবর্তী করেছে।

সেই সঙ্গে গ্রন্থী তাদের বোধকে আরও শাণিত করতেই তাদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠান বিরোধীতার প্রেসক্রিপশন। এর মূল কথা হলো: প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা মানে নয় প্রতিষ্ঠানহীনতা। যা কিছু সাহিত্য ও মননশীলতাকে অপবিত্র করে তুলেছে, হত্যা করে চলেছে সুরুচী ও স্বস্থ জীবনবোধকে তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ, কষ্টকর সংগ্রামে যারা নেমেছি তারাই প্রতিষ্ঠান বিরোধী। আমাদের লক্ষ্য পুঁজির দৌরাত্ম্য ও প্রশ্রয়ে বিকশিত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে

জন্ম দেয়া এমন এক পাল্টা প্রতিষ্ঠানের যেখানে মেধা ও মননের চর্চা এবং তার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি/স্ফুরণ হবে মূল শর্ত। এই প্রতিষ্ঠান বুর্জোয় কাঠামোর চাপানো শক্তি, কৌশলকে অস্বীকার করে নিরত পরিবর্তনীয়।

যারা এই কষ্টকর সংগ্রামে লিপ্ত হতে ভীত, এর ফলাফল নিয়ে সংশয়ী, প্রচলিত এ্যাস্টাবলিশমেন্টে ঝুঁকে পড়তে ঔৎসুক, তাদেরকে বলি আরেকটু ভাবুন--পুঁজির অস্বাভাবিক উল্লম্ফন,মুদ্রার অভূতপূর্ব ক্রিয়েটিভিটি জন্ম দিয়েছে যে পুঁজির যে সংস্কৃতির তার শেষ ভবিতব্য কি? ভুলে যাবেন না, ফ্রাংকেনস্টাইন তার জনককেও ছাড়েনি।

প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়ে যা উৎপাদিত হয় তার কতোটা শিল্পের গুণাগুণ ধরে আর কতোটা শিল্পকে করে বলাৎকার সে বিচারের ভার সর্বস্তরের পাঠক ও মেধাবী তরুণ-প্রজন্মের লেখকদের কাছে রইলো। আফ্রিকান লেখক চিনুয়া আচেবে নান্দনিকতা সর্বস্ব শিল্পকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'ডিওডরান্ট ডগশিট' বলে। চিনুয়া আচেবের কথাটিকে খানিকটা ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে বলছি প্রতিষ্ঠান খুব কমই উৎপাদন করে মননশীলতা এবং প্রায়শই উৎপাদন করে 'ডিওডরান্ট ডগশিট' বা 'গন্ধমাখানো কুত্তার গু'। বন্ধুরা, কতকাল এই 'গু' শুঁকে শুঁকে কাটবে কাল? কতকাল?

বাংলা সাহিত্যে.. দুই বাংলার সাহিত্যেই প্রতিষ্ঠান বলতে যে সব প্রকাশনা, সংবাদপত্র ও এলিট গোষ্ঠীর পোশাকী অবস্থাকে বুঝি তারা সাহিত্যকে চটকদার মোড়কে পরিবেশন করে এসেছে বরাবর। পশ্চিমবঙ্গে আনন্দ পাবলিশার্স, সমধর্মী প্রতিষ্ঠান গলা চিপে ধরেছে মননশীল বোধকে। বাংলাদেশেও ক্রমশই মনন, মেধাকে টিপে মারতে উদ্যত প্রতিষ্ঠানেরা জন্ম নিচ্ছে ধীরে ধীরে। ঝকঝকে অফসেটে, চোখকাড়া ছাপায়, পাঁচমেশালী টক-ঝালের সঙ্গে তারা লেখক ও লেখাকে 'তারকা' বানাবার তালে আছে। সর্বগ্রাসী আবিলতায় সৃষ্টিশীল প্রতিভার সংস্পর্শ পাই না। প্রতিভার বিনষ্টি এদের কাম্য। তাই কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অসীম রায়, দেবেশ রায়, শিবনারায়ণ রায়, অভিজিৎ সেন, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, শওকত আলী, কায়েস আহমেদ এবং আরো অনেকের কোনো বাজার গড়ে ওঠে না। আবার এঁদের অনেকেও কোন না কোন ভাবে পুরোদস্তুর লিটলম্যাগের দৃষ্টি, চেতনার মানুষ হয়েও ঝুকে পড়েন বা ঝুঁকতে বাধ্য হন প্রাতিষ্ঠানিকতায়। এর পেছনে লিটলম্যাগের শক্ত মাটি ও অবলম্বন তৈরি না করতে পারার ব্যর্থতাকেও স্বীকার করতে হয়। আমাদের পূর্বজেরা, এমন কি শ্রদ্ধেয় সুবিমল মিশ্র পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের আগ্রাসন সম্পর্কে সচেতন ও সোচ্চার হলেও সমবায়ী প্রকল্পে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি সৃজনশীল লেখকদের মেধা ও বোধকে। এই না হতে পারার সমস্যাটিকেও বিবেচনার সময় আগত। পুঁজির অবাধ অর্থনৈতিকতায় সমাজতন্ত্রের নতুন ও নিরীক্ষামূলক পঠন যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তখন আমাদের শিল্প সম্পর্কিত ধারণাকে আমূল বদলানো চাই। চাই লিটলম্যাগের লিটলম্যাগ হিসেবে দাঁড়ানোর শক্তি ও সমস্যার আনুপুঙ্খ অনুসন্ধান। এ-পর্যায়ে কয়েকটি বিবেচনা জরুরী:

১. নবীন, উঠতি লেখকদের লেখা প্রকাশ ও প্রচারের নিয়মিত/অনিয়মিত কিন্তু ধারাবাহিক প্রকাশনা।

২. সৎ ও সৃষ্টিশীল পাঠক সমাজ... যারা প্রকৃত সাহিত্যের ভোক্তা হয়ে উঠবে।

৩. লেখার মানের ক্রম-উন্নয়ন। প্রতিযোগিতামূলক আবহ। যা লিটলম্যাগ কর্মীদের উৎসাহিত করবে নিজ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে।

৪. দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সম্ভাবনাময় তরুণদের সাথে যোগাযোগ। যাতে আকাশ সংস্কৃতির যুগে সে নিজেকে পণ্য না করে তোলে।

৫. সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে জ্ঞানের চর্চা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা।

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর লেখক হলেও নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর পান্ডিত্য ও রসিকতার ক্ষমতা অতুলনীয়। তাঁর এক লেখায় বিলাত প্রবাসী আধা ইংরেজ আধা বাঙালী এই লেখক বলেছিলেন যে বাংলার লেখক ও প্রকাশকরা একরকম ধরেই নিয়েছেন, গরুকে মাংস খাওয়ানো যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব বাঙালীকে ভালো ও উন্নত সাহিত্য খাওয়ানো। কিন্তু বাঙালী নিশ্চয় এতোটা বিশুদ্ধ গরু হয়ে যায়নি যে তাকে সিরিয়াস কিছু খাওয়ানো যাবে না। কথাটির ভাবার্থ লিটলম্যাগের আপোষহীন যোদ্ধাদের মনে রাখা আবশ্যক নয় কি?

গ্রন্থী গত সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল গণমানুষের কবি দিলওয়ার সংখ্যা বের করার। সিলেটে বসবাসরত এই কবি সাহিত্যিক দলাদলির কারণে তাঁর যথাযথ স্বীকৃত পাননি বলেই গ্রন্থী উদ্যোগী হয়েছিল তাঁকে সম্মান জানাতে। কিন্তু আমরা দিলওয়ার সংখ্যা বের করার জন্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাইনি কোন মহল থেকেই। তদুপরি, গ্রন্থীর বর্তমান ভূমিকায় কবি দিলওয়ারও প্রশ্নের সম্মুখীন। সম্মুখীন এ কারণে যে তিনি তাঁর মেধা, সৃজনশীলতাকে কি ক্রমেই বিকিয়ে দেননি বাজারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কদর্য হাতে? হয়তো তাঁর অক্ষমতা ছিল, হয়তো এর পেছনে রয়েছে নিগৃহীত হওয়ার যন্ত্রণা। তারপরেও এক পর্যায়ের অমিত সৃষ্টিশীল দিলওয়ারকে কিংবা তাঁর মতো সৃষ্টিশীল কলম-সৈনিককে গ্রন্থী জানায় তার ভালবাসা। না, কারো প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নেই। আছে, প্রকৃত মননশীলতার মাপকাটিতে প্রত্যেকের কর্মকে গ্রহণের আকাঙ্খা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আশির দশকের শক্তিমান কবিতা কর্মী কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ারকে আবারো আঁক্ড়ে ধরেছে সিজোফ্রেনিয়া। তার প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। প্রতিভাবান এই কবির জন্য কিছু একটা করার দায় আমাদেরও আছে। যাতে এই কবি আবার ফিরে পান তার স্বাভাবিক সৃজনক্ষমতা। আমরা কি পারিনা তাকে আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে?

অনেক অপূর্ণতা, সীমাবদ্ধতার মধ্যে গ্রন্থীর নব পর্যায়ের যাত্রা। পথ বাকি অনেক। সেই যাত্রাপথে যারা আমাদের বন্ধু, সাথী, শুভাকাঙ্খী তাদেরকে গ্রন্থী জানায় নীল-খাম শুভেচ্ছা।

বন্ধুরা, এভাবেই সবকিছু বদলায়। বদলেছে, বদলাচ্ছে, বদলাবে। দেখা হবে আবারো।

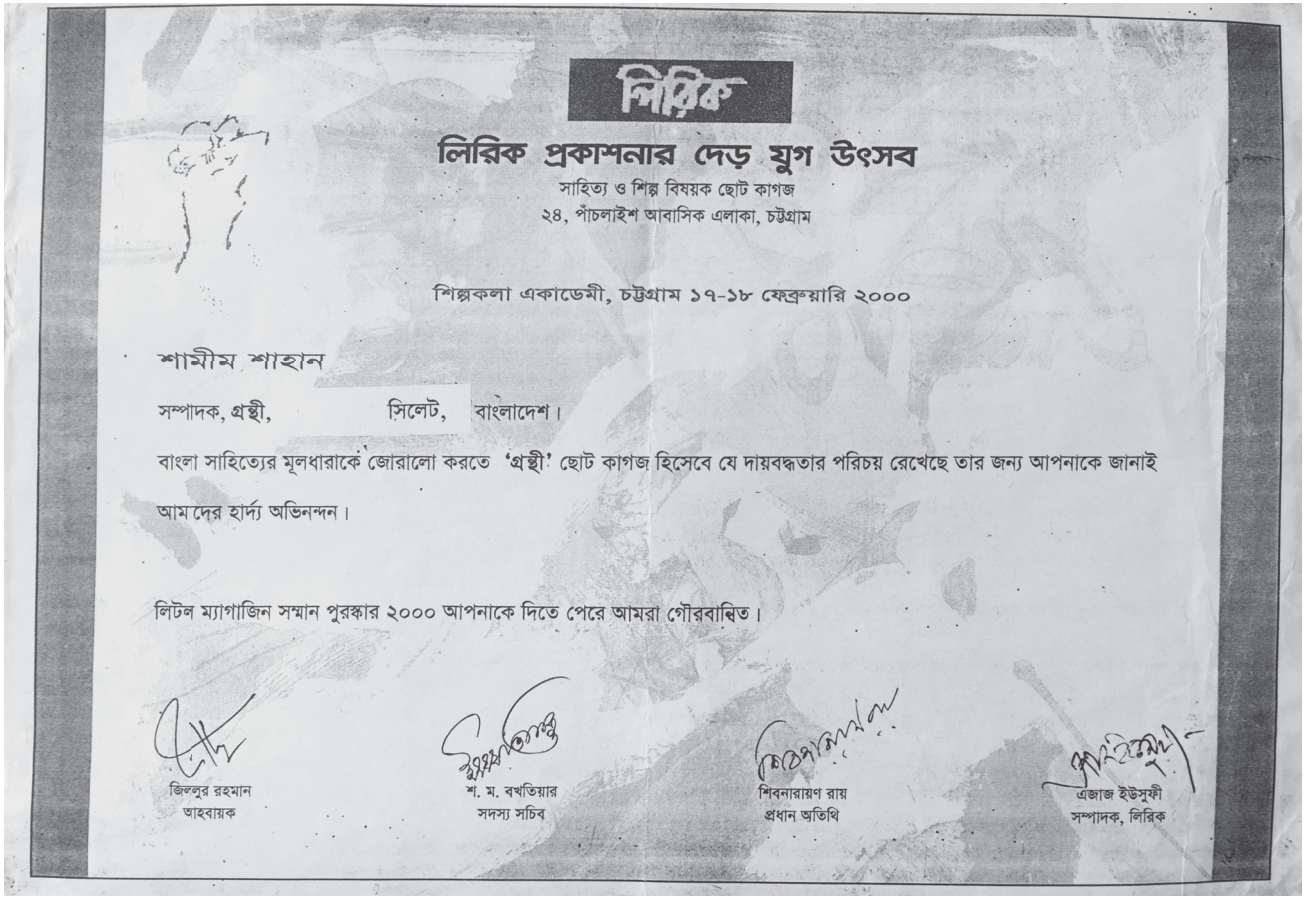

পরিশিষ্ট: ৬ (সম্মাননা: লিরিক এওয়ার্ড ২০০০, চট্টগ্রাম; দুই বাংলার লিটল ম্যাগ এওয়ার্ড ১৯৯৮, কলকাতা)।

লিরিক

লিরিক প্রকাশনার দেড় যুগ উৎসব

সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক ছোট কাগজ

২৪, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম

শিল্পকলা একাডেমী, চট্টগ্রাম ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০০

শামীম শাহান

সম্পাদক, গ্রন্থী, সিলেট, বাংলাদেশ।

বাংলা সাহিত্যের মূলধারাকে জোরালো করতে 'গ্রন্থী' ছোট কাগজ হিসেবে যে দায়বদ্ধতার পরিচয় রেখেছে তার জন্য আপনাকে জানাই আমাদের হার্দ্য অভিনন্দন।

লিটল ম্যাগাজিন সম্মান পুরস্কার ২০০০ আপনাকে দিতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত।

জিললুর রহমান
আহবায়ক

শ. ম. বখতিয়ার
সদস্য সচিব

শিবনারায়ণ রায়
প্রধান অতিথি

এজাজ ইউসুফী
সম্পাদক, লিরিক

RadhaRaman Society

RadhaRaman Society mainly organises a yearly festival of Bengali folk music and dance called RadhaRaman Folk Festival in the North of England (Leeds) since 2011 and Baul and Vaishnav Music Festival in London since 2013

This is purely a community art organisation that promotes the grandeur of Bengali colourful folk music and dance as serious art forms for young Bengali diaspora around the world as well as the audience from diverse cultural background in the West through collaboration with other form of folk music and dances e.g. jazz, Irish dance etc.

RadhaRaman festival is considered now as the biggest Bengali cultural and art festival in the North which connected the audience from London, Birmingham, Manchester, Oldham, Bradford, Rochdale etc. on top of the local audience from mainly the east as well as other areas of Leeds.

The society propagates the glory of Bengali mystic philosophy and deep humanism through folk music, dance and other collaborative art forms. It is playing a pioneering role in promoting a unique art form Bengali ancient rural theatre called Pala Gaan (Bengali Opera/ Bengali Folk Ballad) in the West. It engages young people, socially excluded women, too, into the pride-worthy cultural heritage of Bengal through highly connecting art activities and deliberately play a vital role to combat growing religious fanaticism.

RadhaRaman Society
Unfurling Bengali Folk Culture

email: sudipta.chowdhury75@gmail.com
www.radharamanleeds.wordpress.com